ইসলাম ও বিজ্ঞান

প্রফেসর ড. নাজিমুদ্দীন এরবাকান

ইসলাম ও বিজ্ঞান

প্রফ. ড. নাজিমুদ্দিন এরবাকান

প্রত্যয় প্রকাশনী, ঢাকা

www.amarboi.org

ইসলাম ও বিজ্ঞান
নাজীমুদ্দীন আরবাকান

© Author

ISBN: ....

প্রকাশক
প্রত্যয় প্রকাশনী
৬৫/২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা- ১২১৭
মোবাইল: ০১৬৮৪৫১১৬৬৮
ই-মেইল:

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১৪

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : বিনামূল্যে বিতরনের জন্যে

ISLAM O BIGGAN (Islam & scince) by ...., Published by ....i Prokashoni, ... Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217. Bangladesh. Phone: .... Mobile: .... E-mail: .... 1st Edition: July 2014.

www.amarboi.org

সূচিপত্র

ডবষয়	পৃষ্ঠা
ইসলাম ও বিজ্ঞান	৫

www.amarboi.org

আমাদের কথা

www.amarboi.org

ইসলাম ও বিজ্ঞান

আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা পেশ করতে চাই। সংক্ষিপ্তভাবে আমি এর নাম করণ করেছি 'ইসলাম ও বিজ্ঞান'। আমি আমার আলোচনায় কেন এই বিষয়টিকে নির্বাচন করলাম ইনশাল্লাহ আশা করি আমরা সকলেই উক্ত আলোচনা হতে বুঝতে পারব। এরকম একটি বিষয়ে আলোচনা করা আজকে সময়ের একটি দাবি। কেননা একজন মুসলিম হিসাবে দুনিয়ার অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা আজ সময়ের একটি দাবি। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সোনালী অতীতের চিন্তা চেতনাকে লালন করতে না পারার কারণে আমাদেরকে সর্বদাই ভিত্তিহীন কিছু চিন্তাধারার ও চিন্তা চেতনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে এটা সত্য যে, ভিত্তিহীন চিন্তার সাথে আমাদের চিন্তার এই সংগ্রাম আমাদের মুসলমানদের সম্মান ও মান মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে। অপরদিকে পশ্চাত্যের এই ভিত্তিহীন চিন্তাধারা আমাদের দেশে আমাদের ধর্ম আমাদের সংস্কৃতিকে জানার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসাবে দাঁড়িয়েছে। আজ জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা কি ছিলো এবং ইসলাম জ্ঞান ও বিজ্ঞানে কি অবদান রেখেছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করব। আমি কেন আজ এই বিজ্ঞান কে বেছে নিলাম? আমি নিশ্চিত যে, আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত তাদের অধিকাংশই এই সম্পর্কে জানি না। কেন আমরা জানি না? কারণ আমরা এই সম্পর্কে জানার ও শেখার সুযোগ পাইনি।

আমাদের মূল বিষয়ে যাওয়ার পূর্বে, একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করে আমরা আমাদের মূল বিষয়ের গুরুত্বকে জোর দিয়ে বুঝাতে চাই। ইসলামী চিন্তা ও চেতনায় কিন্তু কোনো প্রকারের ঘাটতি নেই। কিন্তু ভুল পদ্ধতির কারণে আমরা ভুল পথে পরিচালিত হতে পারি। আর সেটা হলো ইসলাম এখনো তার পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে আমাদের মাঝে বিরাজমান। ইসলাম আমাদেরকে আখিরাতের জীবনের ওহির জ্ঞান, নৈতিক চরিত্র গঠন, মানসিক উন্নয়ন ও জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে ও বিভাগের ব্যাপারে আমাদেরকে যে মূলনীতি সমূহ দিয়েছে আমরা সেগুলো জানি। কিন্তু আমরা ভাবি কি, ইসলাম প্রদত্ত মূলনীতি সমূহের বাহিরেও নীতি পদ্ধতি রয়েছে। কি আছে ইসলামের বাহিরে? আমেরিকা ও ইউরোপের বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হচ্ছে। মঙ্গল গ্রহ ও চাঁদে যাচ্ছে। এগুলো যে মানুষ করছে তাদের এই সকল কর্মকান্ড কি কুরআনে প্রদত্ত আলোকে হচ্ছে? নাকি হচ্ছে না? আমি মনে করি আমরা এটা

দাবি করি না অর্থাৎ কুরআনে প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে হচ্ছে না বলে আমরা মনে করি। আমরা বলে থাকি যে, তারা সৌরজগৎ-এর প্রতিটি সেকেন্ডকে হিসাব করে এটা বের করে থাকেন যে, চাঁদে যাব এই সময়ে, মঙ্গলে যাব এই সময়ে এমনকি তারা তাদের বের করা সময়ে পৌঁছতে ঠিকই সক্ষম হচ্ছে। তাদের এই গবেষণা বা কর্মতৎপরতার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, তাদেরও একটা জ্ঞানের উৎস আছে বা সত্যের উৎস আছে। আর এর মাধ্যমে আমরা ইউরোপীয় ও আমেরিকানদেরকে একটি মূল্যায়ন দিয়ে থাকি যে, ইসলামের বাহিরেও চিন্তা ও সত্যের উৎস রয়েছে, না হলে তারা এই সকল কাজ করতে সমর্থ হয় কিভাবে?

এখন আমরা আমাদের এই বক্তব্যে যুক্তির আলোকে এই কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে, 'ইসলামের বাহিরে সত্যের কোনো উৎস নেই' ইসলাম ছাড়া আর কোনো সত্য নেই। আচ্ছা তাহলে ইউরোপের বিজ্ঞানীরা অতি আশ্চার্য যে কাজগুলো করতেছে তাহলে সেগুলো কি? এগুলো কোথা থেকে জনসমক্ষে আসছে? তাদের এই সকল কার্যক্রমের উৎস বা ভিত্তিমূলে কি আছে? ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও তাদের চিন্তাধারা ও ইসলামী মূলনীতির মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান সেটাকে বের করার চেষ্টা করব। আমি আমার কথাকে এইভাবে শুরু করতে চাই যে, আমরা যদি এখন বের হয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করি, যখন বাহির থেকে দেখি তখন আমরা বলে থাকি 'উ- আউ কত বড় বিল্ডিং! কত বিশাল সেতু! এগুলো কিভাবে বানালো? তারা কিভাবে তাদের তৈরি এই সকল বিমানে করে চাঁদে যায়? মঙ্গলে যায়? এই সকল বড় বড় বিজ্ঞানাগারে তারা কিভাবে কাজ করে থাকে?'এই সকল কথা বলতে বলতে আমরা এই সকল জিনিসকে পর্যবেক্ষণ করে থাকি। আমেরিকা থেকে চাঁদে গমনকারী যে কোনো রকেট এর নিয়ন্ত্রণকারী কোনো অফিসে যদি গিয়ে সেখানে কর্মরত একজনের সাথে কথা বলি এবং সে ব্যক্তির জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু তা যদি পরীক্ষা করতে শুরু করি আমরা সহজেই সেই ব্যক্তিকে খুব শ্রদ্ধার সাথে দেখতে থাকব।

চলুন দেখা যাক আমাদের দৃষ্টিতে সেই বড় ব্যক্তিটিকে একটু পরখ করি। যে সকল বিজ্ঞানীরা সেখানে কাজ করেন ও সেই সকল বিজ্ঞানাগারকে রক্ষণাবেক্ষন করেন তার কাছে বসে যদি তাকে প্রশ্ন করি আপনি এখানে কি করেন? সে নিশ্চয় বলবে: 'আমি অমুক রকেট এর অমুক গতি পথকে নিয়ন্ত্রণ করি' কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন? 'সে উত্তর দিবে যে আমি শুধু মাত্র এই যন্ত্র বা যন্ত্রাংশটুকুকে নিয়ন্ত্রণ করি। আমরা যদি তাকে প্রশ্ন করি যে এই যন্ত্র বা যন্ত্রাংশটি কিভাবে তৈরি হলো? সে হয়ত কিছু সূত্রের কথা বলবে বা কিছু সূত্র লিখে দিবে। সে হয়ত এই সূত্রগুলোর আগে কিছু সংখ্যা অথবা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করবে।

তখন আমরা আমাদের নিজেদের অজান্তেই বলে উঠব যে, আমরা যা কোনো দিন বুঝি না বা জানি নাই সেরকম একটি বিষয় সম্পর্কে উনি আমাদের অবহিত করছেন। তথাপি, একজন মুসলিম হিসাবে আমরা যখন এরকম একটি ব্যাপারকে মোকাবেলা করব, তখন আমাদের উচিত হবে না যে, এর প্রতি খুব বেশি গুরুত্বারোপ করা। বিজ্ঞানাগারে কর্মরত ব্যক্তিকে যখন আমরা প্রশ্ন করব তিনিও তখন আমাদের সাথে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সূত্রাবলী নিয়ে আলোচনা করবেন। চলুন এখন আমরা তার প্রদর্শিত সেই সূত্রাবলী নিয়ে আলোচনা করি।

দেখুন, সেই বিজ্ঞানী আমাদের যে সূত্র থেকে কথা বলেন বা দেখান না কেন সে সূত্রের গঠন ও সেই সূত্রটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সত্যিকার অর্থে তাদের তৈরি উদ্ভাবিত সে সকল সূত্র ও সূত্রাবলী শুধুমাত্র তাদের চিন্তার একটি ব্যাখ্যামাত্র। উদাহরণ স্বরূপ সেই বিজ্ঞানীর চাঁদে রকেট প্রেরণের হিসাবের সাথে সাধারণ একটি পাথরের একই উচ্চতা থেকে মাটিতে পড়ার যে হিসাব তার থেকে ভিন্ন নয়।

যারা শুধু মাত্র পদার্থ বিজ্ঞান পড়ছে অথবা শুধু মাত্র কলেজের গন্ডিকে পেরিয়েছে তারাও এই সময়টাকে হিসাব করতে পারে। আমরা যদি উচ্চ মাধ্যমিক পাস অথবা উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়নরত একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করি যে, দশ মিটার উচ্চতা থেকে একটি পাথর মাটিতে পড়তে কতটুকু সময় লাগবে? এই একই প্রশ্ন যদি আমরা কোনো মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ারকে করি তারা দুইজনেই একই পদ্ধতিতে এই প্রশ্নের সমাধান করবে। তারা একটি সূত্রকে ব্যবহার করবে আর সেটা হলো : H= 1/2G তাই সূত্রে যেখানে S হলো সময় এবং আমরা এটাকে $\sqrt{2H/G}$ এইভাবে লিখতে পারি। যেহেতু H হলো ১০ মিটার, এবং আমরা G কেও ১০ ধরতে পারি যেখানে S সময় ১.৪১। ফলাফল হিসাব করে দেখা গেল ১০ মিটার উচ্চতা থেকে একটি পাথরকে ফেলে দিলে ১.৪১ সেকেন্ড পর এটি মাটিতে পৌঁছে। সত্যিকার অর্থে আমরা একটি পাথরকে ১০ মিটার উচ্চতায় জানালা থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করলে আর আমরা যদি টাইম ওয়াচ দিয়ে হিসাব করি তাহলে একই সময় দেখতে পাই।

এখানে কি এমন বিশেষত্ব আছে যে, বিজ্ঞানী সেটা জানে? এটা খুবই সহজ একটা ব্যাপার যে, আমরা যদি এটাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে যা পাই তাহলো- এই হিসাব করার সময় আমরা যদি প্রশ্ন করি, এই হিসাব আপনি কিভাবে করলেন? এই ফর্মূলাটাকে কোথায় পেলেন? সে আমাদেরকে বলবে কি এই পাথরটি এখান থেকে নিচে পড়ার সময় ভূমি এটাকে আকর্ষণ করে। আর এখানে মূল বিষয় হলো মধ্যাকর্ষণ শক্তি। একটি শক্তি এটাকে তার দিকে

আকর্ষণ করে। পাথরটি মাটিতে পড়ার সময় এটা তরঙ্গায়িত হয়। আর এই গতি তরঙ্গের কারণেই এটাতে একটা গতির সৃষ্টি। আর এর গতিবেগের আকর্ষণ (Magnitucle) উপর এবং নীচ উভয় দিকেই সমান। এই শক্তি (Force) উভয় দিকেই সমান কেন? এর কারণ হলো ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া। সত্যিকার অর্থেই কি এটা? সম্ভবত সে আমাদেরকে আরও অন্যান্য বিভিন্ন উদাহরণ দিবে। তিনি বলবেন যে, প্রতিটি ক্রিয়ার-ই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রয়া আছে। এই সূত্রটি প্রতিটি পদার্থের ও প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর এই সূত্রটি পৃথিবীর সব জায়গায় গ্রহণযোগ্য আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এর সত্যতা পাই।

আর এটা গোটা দুনিয়াতেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্র নামে পরিচিত, যে প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। আমরা যখন এমন কোনো সমস্যাই পড়ি যেটা পদার্থ বিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত তখন আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রাবলীকে ব্যবহার করে থাকি। অন্যান্য হিসাবের ক্ষেত্রেও আমরা অন্যান্য সূত্রাবলিকে ব্যবহার করে থাকি। এগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হলো ‘পদার্থকে সৃষ্টি করা যায় না বা ধ্বংস করা যায় না, এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা যায় মাত্র। এটা হলো ভরের নিত্যতা সূত্র। আর অপরটা হলো শক্তির সৃষ্টির বা বিনাশ নেই শুধুমাত্র এক রূপ হতে অন্য রূপে রূপান্তর করা যায় মাত্র। এটাকে বলে শক্তির নিত্যতা সূত্র।

আজকের পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যতো কিছুই আবিষ্কার হচ্ছে ও যতো মৌলিক ধারণার উৎপত্তি হয়েছে এর মূলে হলো এই সূত্রগুলো। পদার্থ, রসায়ন ও যান্ত্রিক সকল ক্ষেত্রেই এ সূত্রগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সূত্র তিনটির বাহিরে অন্য কোনো সূত্র নেই যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ ব্যবহৃত হচ্ছে। এই তিনটি সূত্রই হলো বিজ্ঞানের মূল। এই অবস্থায় পাশ্চাত্যের যে কোনো বিজ্ঞানী যখন হিসাব করে আমাদেরকে তার প্রতিভা বা কেরামতি প্রদর্শন করে জেনে রাখবেন যে যতো কিছুরই হিসাব করুন না কেন যতো উদ্ভাবনী শক্তিই প্রদর্শন করেন না কেন সকল কিছুর পেছনেই তার সেই তিনটি সূত্রই বিরাজমান। সেগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো ভরের নিত্যতা সূত্র (Conservation of mass) দ্বিতীয়টি হলো শক্তির নিত্যতা সূত্র (Conservation of Energy) আর তৃতীয়টি হলো ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Action Reaction)।

এখন সকল হিসাব নিকাশ ও তার ফলাফল পাওয়ার পর যে বিজ্ঞানী এটার হিসাব নিকাশ করেছেন ও এই সমস্যা সমাধান করেছেন তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ‘আপনি যখন এই সমস্যাগুলির সমাধান করেন তখন আপনি কিছু টার্ম ব্যবহার করেন, যেমনঃ শক্তি, গতি, পদার্থ এগুলোর দ্বারা আপনি কি বুঝাতে

চান?' যে নিখুতভাবে তার হিসাব সম্পাদন করতে পারবে কিন্তু সে এই টার্মগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা কখনোই দিতে পারবে না। সে এগুলোকে ব্যবহার করছে, এগুলোর দ্বারা তার সমস্যার সমাধান করছে কিন্তু অতীব আশ্চার্যের বিষয় হলো যে এগুলো সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। সে কেন দেখাতে পারে না? দেখুন-উদাহরণ স্বরূপ আমরা যখন পদার্থের কথা বলি এটা কি করে হয় যে মানুষ পদার্থ দেখাতে পারবে না? তাহলে পদার্থ কি? এখানে টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি যেগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলোই তো পদার্থ।

কিন্তু আমরা যখন এটাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখি তখন এটা ততোটা সহজ নয়। একটা টেবিলকে যখন পদার্থের উদাহরণ হিসাবে দেখানো হলো তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই টেবিলটা কি? এইভাবে যখন আমরা প্রশ্ন করতে শুরু করি আর টেবিলকে ঘিরে বড় একটি মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে যদি পরীক্ষা করতে শুরু করি যে, পদার্থ আসলে কি? পদার্থ কি এটা জানার জন্য যখন আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে শুরু করি তখন টেবিলের উপর আমরা বিভিন্ন ধরনের কাঠিন্যতা দেখতে পাই। যখন আমরা এর কাঠিন্যতাকে ভেদ করে এর ভেতরে প্রবেশ করি তখন কাষ্ঠ বা কাষ্ঠ খন্ডের তৈরি এই টেবিলের কাঠগুলোতে আমরা বিভিন্ন কোষ দেখতে পাই। এই কোষগুলোর অভ্যন্তরে যখন আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করি এই কোষগুলোর মধ্যে বিভিন্ন জৈব পদার্থকে দেখতে পাই এবং জৈব পদার্থগুলোর ভেতরেও রয়েছে বিভিন্ন অণু পরমাণু।

যদি আমরা এই সকল অণুগুলোকে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে নিরিক্ষণ শুরু করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, পদার্থের অভ্যন্তরে যে অণুগুলো রয়েছে সেগুলো আবার পরমাণু থেকে তৈরি। পরমাণু কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুজে বের করার জন্য যখন আমরা পরমাণুর ভেতরে প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাই যে, পরমাণুর গঠন প্রণালী ও এর কার্যবিধি সূর্য এবং তার চতুষ্পার্শ্বে আবর্তিত ঘূর্ণায়মান বিভিন্ন নক্ষত্র সমূহের মতই। সূর্য যেমনিভাবে কেন্দ্র তেমনিভাবে এরও একটি কেন্দ্র রয়েছে। আর একে বলা হয় প্রোটন। এই প্রোটনকে কেন্দ্র করে এর চতুপার্শ্বে আবর্তিত হয়। নিউট্রন যেমনিভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ আবর্তিত হয়। সূর্যের চারপাশে যেমনিভাবে পৃথিবী নামক গ্রহ ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ আবর্তিত হয় তেমনিভাবে টেবিলের অভ্যন্তরে প্রতিটি পরমাণুর কার্যপ্রণালী একই নিয়মে চলে।

আচ্ছা এই পরমাণু আসলে কি? যখন আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এটাকে পর্যবেক্ষণ করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, ইলেকট্রন এবং প্রোটনের মধ্যে রয়েছে একটি বিশাল দূরত্ব এই একই কার্যপ্রণালী আমরা সৌরজগত এর ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। সূর্য এবং তারকা সমূহের মধ্যেও রয়েছে বিশাল এক

দূরত্ব। যখন আমরা টেবিলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি তখন আমরা এখানে ফাকা জায়গা দেখতে পাই। আমরা খোলা চোখে দেখি যে এটি কোনো বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এটি বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ নয়। এর ভেতরে রয়েছে ফাকা। এখানে রয়েছে শুধু মাত্র ইলেকট্রন প্রোটন। নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন এর মধ্যকার দূরত্ব সূর্য এবং তারকাদের মধ্যে অবস্থিত দূরত্বের দশগুণ। আমরা এটাকে পরিপূর্ণ ভাবতাম। হ্যাঁ যখন আমরা বাহির থেকে দেখি তখন এটাকে পরিপূর্ণই (full) দেখতে পাই। কেননা আমরা এর ভেতরে দেখতে সক্ষম নই। আমাদের চর্ম চক্ষু এটাকে দেখতে সক্ষম নয় যে এর ভেতরে পুরোটাই ফাঁকা (empty)

এখন যখন আমরা আমেরিকার সেই বিজ্ঞানাগারে গবেষণারত বিজ্ঞানীটিকে নিয়ে এসে ও একটি মাইক্রোস্কোপ হাতে দিয়ে এই ফাকা জায়গা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, জনাব আমাদেরকে হিসাব দেখানোর সময় পদার্থ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, এখন সেই ( ) গুলো কোথায়? সে এর কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হবে না। কেননা এই ইলেকট্রন ও প্রোটনগুলো হলো পরমাণুর সাধারণ উপাদান, এদের কোনো ওজন ও উল্লেখযোগ্য কোনো আয়তন নেই (do not have important weights and Voluame)। উদাহরণ স্বরূপ যদি আমরা দুনিয়ার সকল স্বর্ণের কথাই ধরি, যদি আমরা স্বর্ণের পরমাণু গুলোর অভ্যন্তরে ফাকা জায়গা গুলোকে পরিপূর্ণ করার জন্য পরমাণুগুলোকে সংকোচিত করতে পারি তাহলে সকল স্বর্ণ শুধুমাত্র একটি আঙ্গুল (thimble)-এর মাথাকে ডুকাতে যে ফাকা জায়গা প্রয়োজন সেটাকে পরিপূর্ণ করতে পারে কিন্তু এটা আমাদের সকলেরই জানা যে, দুনিয়াতে যে পরিমাণ স্বর্ণ রয়েছে এটা লিবসন ও সাইবেরিয়ার মধ্যবর্তী জায়গাকে পরিপূর্ণ করতে পারবে। চিন্তা করুন এটা গোটা ইউরোপকে পূর্ণ করে দিতে পারবে। যখন আমরা নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন এর মধ্যকার এই দূরত্বকে কমিয়ে নিয়ে আসি তখন গোটা দুনিয়ার স্বর্ণ নামক এই বস্তুকে একটি অঙ্গুলিস্তান (thimble) এ জমা করতে পারি। এটা আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, শুধু মাত্র হালকা বা সহজ পদার্থ সমূহ নয় বরং স্বর্ণের মতো ভারি বস্তুকেও শূন্যতা থেকে গঠন করা হয়েছে। যদিও বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, বাস্তবিকভাবে ইলেকট্রন কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে না। তাহলে তারা কোথায় অবস্থান করে? দাবি করা হয়ে থাকে যে, যেখানে ইলেকট্রন এর কোনো অস্তিত্ব নেই আছে শুধু মাত্র তরঙ্গ (wave), তরঙ্গ (wave) নিউক্লিয়াস এর চতুষ্পার্শে আবর্তিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সেখানে কোনো বস্তুর/পদার্থের (meter) এর অস্তিত্ব নেই। তাহলে এটা কোন্ প্রকারের তরঙ্গ? যদি আমরা এই অডিটরিয়ামের একপাশ থেকে অপরপাশ পর্যন্ত রশি টানিয়ে দেই এবং এর একপাশ থেকে এটিকে তরঙ্গায়িত করি তাহলে এটি অন্য

প্রান্তে গিয়ে পৌঁছে। এখানে আপনারা গ্রহণ করেন যে ইলেকট্রন আবর্তিত হয়, কিন্তু না ইলেকট্রন ও আবর্তিত হয়না। তাহলে কি আবর্তিত হয়? আবর্তিত হয় মূলত এই তরঙ্গ। এখানে পদার্থ বলতে কিছু নেই।

তথাপি আজকের পাশ্চাত্য বিশ্ব কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও মনে হয় যে তারা কিছু কাজের প্রজেক্ট ও গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা এটা অনুধাবন করে না যে, তা কি ব্যবহার করছে। এমন কি তারা এটাও উপলব্ধি করেনা যে, তারা কিসের উপর ভিত্তি করে তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছে। আজকে পাশ্চাত্যের একজন মানুষের পদার্থ (meterial) শক্তি (energy) ও বল (Force) সম্পর্কে ধারণা নেই। আমরা কেন আজকে এর উপর এতো দৃষ্টিপাত করছি? এই মুহুর্তে কি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়? আমি এখন অন্য একটি ব্যাপারকে তুলে ধরতে চাই।

যখন আমাদের মুসলিম ভায়েরা পাশ্চাত্যের কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করে বা পাশ্চাত্যের সাথে কোনো ব্যাপারে আলোচনায় আসে তখন তাদেরকে পাশ্চাত্যের আচরণকে সহ্য করতে হয়। তারা মুসলিমদেরকে তাদের তুলনায় পাশ্চাদমুখী ও নিকৃষ্টভাবে। অথচ তারা যে নিজেরাই ছোট (inferior) এটা তারা জানে না। আজকের এই বক্তব্যে আমি এটা প্রমাণ করব যে, মুসলিমদেরকে যারা নিকৃষ্ট/ছোট (inferior) ভাবে তারাই বরং ছোট, মুসলিমরা ছোট নয়।

তারা নিজেদেরকে না চিনেই, নিজেদের অবস্থানকে দৃষ্টিপাত না করেই, তার অবস্থান কি? এটাকে উপলব্ধি না করেই তারা বলে থাকে যে, বিজ্ঞান হলো জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা। তাদের মতে বিজ্ঞান কি? দেখুন তারা চাঁদে যায়, তারা মঙ্গলসহ মহাকাশে গিয়ে থাকে। কিন্তু কোন পথে, কিভাবে, কোন উপায় অবলম্বন করে থাকে, তারা এ সম্পর্কে জানে না। যখন আপনি তাদেরকে এই সকল হিসাবের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন সে এর জবাব দিতে পারবে না। যদিও তারা দিতে পারে তবে তারা বলবে যে, এ সকল কিছুর উৎস হলো কিছু সূত্রমালা। এই সূত্রগুলো থেকেই তারা তাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তারা বলে যে, এটা আমাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, এই সূত্রগুলোর উপর ভিত্তি করেই আমরা সকল কিছুই উদ্ভাবন করে থাকি। এই সূত্রগুলো কি? এই সূত্রগুলো হলো '১. প্রত্যেকটি ক্রিয়ার-ই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। ২. কোনো পদার্থ ও শক্তিকে সৃষ্টি ও ধ্বংস করা যায় না শুধুমাত্র এক অবস্থায় রূপান্তর করা যায় মাত্র।" আচ্ছা আপনার মতে যে পদার্থের কথা বলছেন এই পদার্থ বলতে কি বুঝায়? শক্তি (energy) ও বল (force) বলতে কি বুঝায়? যখন আমরা এই সকল প্রশ্ন তাদের সামনে পেশ করি তারা এর সঠিক কোনো জবাব সংক্ষিপ্ত ও সঠিকভাবে পেশ করতে পারে না। কেন পারে না তারা? কারণ হলো সত্যিকারের জ্ঞান বলতে কি বুঝায় তারা তা জানে না। তারা এই ছোট

www.amarboi.org

ব্যাপার গুলোকেই সবচেয়ে বড় জ্ঞান বলে ধারণা করে থাকে সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞান শুরু হয় মূলত এখান থেকে। যেখানে এসে তারা থেমে যায় সেখান থেকেই আসল জ্ঞান ও বিজ্ঞান শুরু হয়। তারা কিভাবে আমাদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবে যেখানে তারা পদার্থ/বস্তু সম্পর্কেই অবগত নয়। তেমনিভাবে সে জানে না যে, শক্তি কি (energy), বল (force existence) কি ও ভর (mass) কি? পদার্থ বা বস্তু (Subtance metarial) নামে কোনো কিছু আছে না কি নাই? তাহলে তোমরা আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পার না। দেখুন আপনাদের কেউ বলে এভাবে, কেউ বলে সেভাবে আবার কেউ বলে হ্যাঁ পদার্থ (Subtance metarial) আছে। আবার কেউ বলে না পদার্থের (Subtance) এর কোনো অস্তিত্ব নেই। আবার কেউ বলে এটা হলো তরঙ্গ। এটা ওটা নানান কিছু।

আপনারা জেনে থাকবেন যে, এদের মধ্যে অন্যতম হলো আইনস্টাইন (Einstein) যে হলো একজন ইয়াহুদী বিজ্ঞানী যে তার সারা জীবন এই সকল গবেষণায় কাটিয়েছে। সে তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বলেছিল আমি প্রায় সারা জীবন বিজ্ঞান গবেষণায় কাটিয়েছি। আমি শক্তি (energy) বল, (force) এবং পরমাণু (Atom) সম্পর্কে অধ্যায়ন করেছি এগুলো নিয়ে হিসাব নিকাশ করেছি। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও এগুলো সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অবগত হতে পারলাম না। তথাপি আমি আপনাদেরকে একটা বিষয়ে অবগত করতে চাই। যদি আমরা শক্তি (energy), বল (force), পদার্থ (Substance) এর জায়গায় অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণাকে গ্রহণ করতাম তাহলে কি আমরা একই ফলাফল পেতাম? নাকি সহজ কোনো হিসাব বের করতে পারতাম? এটা আমরা জানি না। কিন্তু আমি ধারণা করি যে, পদার্থ (Substance) শক্তি (energy) বল (force) এগুলো একে অপরের থেকে ভিন্ন নয়।

আমি এগুলোকে একই ব্যাপার মনে করে থাকি। আমি মনে করি যে, এগুলো একই জিনিস আর সেটা হলো শক্তি (energy) আর এটি কখনো পরিণত হয় পদার্থে (Substance) আবার কখনো বা বলে (force)। আমি এটা ধারণা করতে পারি যে, এটা কি? কিন্তু আমি এটাকে বিশ্লেষণ করতে পারি না। যেমনিভাবে আমরা যখন পরমাণু (Atom) কে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করি তখন এটা শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তেমনিভাবে শক্তিকে (energy)কে যখন একত্রিত করা হয় তখন এটা পদার্থে (Substance) পরিণত হয়। তথাপি পদার্থের ক্ষেত্রে কি ঘটে? শক্তি কি? এগুলোর আসল কোনটি? আজ আমরা এই সকল প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য যদি পাশ্চাত্যের জ্ঞানে পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জনকারী আইনস্টাইনকে জিজ্ঞাসা করি তিনিও এসকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। অবশেষে তাদের জ্ঞানের অপূর্ণতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। মুসলিমদেরকে নীচু

(inferior) ভাবে দেখার পূর্বে তাদের নিজেদের এই হীনতাকে পর্যালোচনা করা উচিত। তারা সর্বদাই একটি কঠিন সমস্যা মোকাবেলা করে থাকে। আর তাদের এই সমস্যার (Complexity) এর মূল কারণ হলো সঠিক জ্ঞানের অভাব। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সূত্রকে অবলম্বন করে তাদের হিসাব নিকাশ করে থাকে কিন্তু আজকে তারা তাদের হিসাব নিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ব্যার্থতার পরিচয় দিচ্ছে। এজন্য আজ আমরা তাদের মুখে বিভিন্ন হতাশার বাণী শুনতে পাই, কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে এর মূল কারণ অনুসন্ধান করেন না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে আমাদের ছাত্রদেরকে ডক্টরেট করিয়ে থাকি। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতেও ডক্টরেট (PHD) করার দিকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। গবেষণার সময় বা গবেষণার বিষয়ে আমাদের এমন অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যেটার সমাধান আমরা কেউ দিতে পারি না। কিন্তু প্রায় সময়ই আমরা ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাই কিংবা গোপন রাখি। কিন্তু এটা আমাদের বলা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সে সাথে মানুষের অক্ষমতাটাও তুলে ধরা।

এখন পাশ্চাত্যের নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছে এমন কারো সাথে যদি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি আর আপনারা যদি আমাদের বিচারক থাকেন। আর আমি যদি বলি "পাশ্চাত্যের করা বিভিন্ন হিসাব নিকাশ, তাদের ব্যবহৃত সূত্রাবলী সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে তারা অবহিত নয়, দ্বিতীয়ত, তারা তাদের এই সকল হিসাব নিকাশ গবেষণার সময় সর্বদাই একটি জটিলতায় (Complexity) থাকে। তারা এই সকল জটিলতার সমাধানে মোটেও সক্ষম নয়।" আচ্ছা তাহলে তারা তাদের ডক্টরেটে (PHD) গবেষণায় কি করে থাকে? আমি আপনাদেরকে বুঝাবো তারা বা আমরা কি করে থাকি।

উদাহরণ স্বরূপ আমার গবেষণার বিষয় হলো সাগরে জাহাজ চালনা পদ্ধতি বা গতিবিধি এরথেকে তরঙ্গগুলো কিভাবে গঠিত হবে বা কিভাবে এর তরঙ্গগুলো সাগরে মিশে যাবে? আমাদের প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণ করা বা আমরা যেটাকে জ্ঞান বলে অবিহিত করে থাকি সে ব্যাখ্যা মতে, আমরা জাহাজকে সাগরে চালনা করি, জাহাজের পেছনের ঢেউগুলোর ছবিগুলো সংগ্রহ করার পর সকলেই টেবিলে বসে পর্যালোচনা করি যে, জাহাজ পরিচালনার পর তরঙ্গগুলোর এইভাবে প্রবাহিত হয়েছে। আমাদের এই হিসাবকে পূর্ণ করার জন্য সেই সূত্র তিনটিকে যদি লিখি এবং লেখার পর যদি সমস্যাটিকে সমাধান করার জন্য চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমরা এর কোনো সমাধান দিতে পারি না। কেননা আমাদের মাথায় এর যুক্তি বুঝে আসে না। আমরা এর নিখুঁত তথ্য ও তত্ত্ব নির্ভুলভাবে না জানার কারণেই আমরা এর সঠিক

www.amarboi.org

কোনো উত্তর খুঁজে পেতে সক্ষম নই। এরপর আমরা সহজ রাস্তা বের করার চেষ্টা করি কিন্তু সত্যিকার অর্থ বের করতে ব্যর্থ হয়ে সহজভাবে সমাধান করার চেষ্টা করার নাম জ্ঞান নয়। নিজে নিজেই সহজতর পথ বেছে নেওয়া অনেকটা চিত্রাকরের ছবি আকার মতো যে তার মনের মাধুরী মিশিয়ে তার ছবিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে ছবির কোনো অংশ আঁকতে সক্ষম না হলে সে অন্য কোনো ভাবে এটাকে আঁকার চেষ্টা করে থাকে। আমরা চাই যে, আসল ছবিটি আমার অংকনকৃত ছবির আলোকে দর্শকদের সামনে আনতে। আমরা কেন এরকম কাজের দিকে এগিয়ে যাই? কেননা আমাদের ব্যবহৃত সূত্র ও পদ্ধতিসমূহকে সমাধান করার জন্য পর্যাপ্ত গাণিতিক জ্ঞান আমাদের নেই। আমরা যে পথে সকল গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করি সেটা হলো সীমাবদ্ধ একটি পথ। পাশ্চাত্যের যে প্রযুক্তি ও জ্ঞানকে ব্যবহার করে রকেট এর মাধ্যমে চাঁদে যাবে, এটাকে আপনারা জ্ঞানের সর্বোচ্চ চূড়া হিসাবে ধরবেন না। পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞান এমন একটি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, এখান থেকে তারা আর খুব বেশিদূর এগুতে পারবে না।

আমার এই সকল উদাহরণ এর মূল উদ্দেশ্য হলো পাশ্চাত্যের অসরতা প্রমাণ করা। যারা নিজের বড়ত্বকে প্রকাশ করে মুসলিমদেরকে খাটো করে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তারাই মুসলিমদের কাছে চিরঋণী। যদিও বা তারা নিজেদেরকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারক ও বাহক করে পেছন থেকে বলে যে 'মুসলিমরা নীচু, তারা কিছু জানে না' সত্যিকার অর্থে তারা জানে না যে, তারা কি করছে। এটা তাদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তাদের এই অহংকার তাদের জন্য এমন একটা পথ যেখান থেকে তারা বের হতে পারবেনা। এর ফলাফল কি হবে তাহলে? বন্ধ পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য মুসলিমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপারে কি মতামত পোষণ করে সেটাকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

মুসলিমগণ এই সূত্রবলী ও হিসাব নিকাশের পদ্ধতিতে কিভাবে দেখে থাকে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে যে, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যবহৃত আশ্চার্য জনক সূত্রাবলী কাদের দ্বারা অবিস্কৃত। প্রথমেই এটা আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত। যদি পাশ্চাত্যের কোনো বিজ্ঞানী বলে যে, সে সকল বিষয়ে জ্ঞান রাখে তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে তার জ্ঞানের স্বল্পতা আছে। আমরা সকলেই জানি যে, পৃথিবীর সকল মানুষের জ্ঞানকে যদি একত্রিত করা হয়, তাহলেও মহান আল্লাহ তায়ালার যে জ্ঞান তার সাথে তুলনা করলে সাগরের এক বিন্দু পানির সমান ও হবে না। এই জন্য সামান্য জ্ঞানের অধিকারী মানুষের অহমিকা করা কখনো শোভা পায় না।

যদি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীগণ মহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞ হত এবং তার জ্ঞানের বিশালতা সম্পর্কে জানত তারা এতো অহমিকায় মত্ত হতনা। সে তার নাফরমানীর বদলে আল্লাহ তায়ালার কাছে আরও জ্ঞানের প্রার্থনা করত। আমরা যদি সকল জ্ঞান বিজ্ঞানকে একত্রিত করে হিসাব করা শুরু করি যে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যতো জ্ঞান এসেছে এগুলো কোথা থেকে এসেছে এগুলোর মালিক কে? এ জ্ঞান কিভাবে কোথা থেকে আসল? এটাকে অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা একথা জানি যে, আজকের পৃথিবীতে যতো জ্ঞান রয়েছে এগুলো মানুষ ক্রমে ক্রমে উন্নতি করেছে।

আজকে আমরা শুধুমাত্র ৫০০০বছরের জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে জানি। কিন্তু ৫ হাজার বছর পূর্বেও মানুষের অস্তিত্ব ছিলো ৫ হাজার বছর পূর্বে লেখা অবিস্কৃত হয়েছিল বলে ৫০০০ বছরের জ্ঞান বিজ্ঞানের ডকুমেন্ট আমাদের কাছে রয়েছে কিন্তু লেখা আবিস্কৃত হওয়ার পূর্বে মানুষ কি জানত তাদের জ্ঞান কতটুকু ছিলো তা আমাদের হাতে নেই। এইজন্যে আমরা ৫০০০ বছর আগে ফিরে যাব এবং দেখব যে, এই ৫০০০ বছরে জ্ঞান বিজ্ঞান কিভাবে উন্নতি লাভ করেছে।

আমরা যদি ধরে নেই যে, প্রথম মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলো। তাহলে মানুষ কিভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে দিন দিন উন্নতির দিকে ধাবিত করেছে? ৫ হাজার বছর আগের একজন মানুষ যে-কিনা প্রস্তর যুগে বসবাস করত তার আবাস ছিলো পাহাড়ের গুহা। সে জানত না আগুন কি? আল্লাহ রব্বুল আলামীন আস্তে আস্তে মানুষকে মেধা ও যোগ্যতা দান করেছেন এবং তার নিয়ামত দান করেছেন। মানুষ সকল সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সৃষ্টি। অন্যান্য প্রাণী যেমন, বাঘ, সিংহ ও বানর এদেরকে আলাহ তায়ালা কিছু সক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষের মতো তাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি দান করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ একজন মানুষ যখন একটি পশুকে ঘায়েল করতে চায় পশুটিকে কিভাবে ঘায়েল করতে হবে এটা সে জানে।

কিন্তু পশু এই পদ্ধতিটি জানে না বা রপ্ত করতে পারে না। মহান আলাহ মানুষকে বুদ্ধি দান করেছেন, বিভিন্ন নিয়ামতে তার চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন। তার নিয়ামতের কারণেই মানুষ বিভিন্ন পথের সন্ধান পেয়েছে নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি আবিষ্কার করছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগুন আবিষ্কারকে সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হিসাবে ধরা হয়। যে সকল মানুষ আগুন আবিষ্কার করেছে তারা হয়ত আগ্নেয়গিরির লাভার উদগীরণ দেখে বিভিন্ন পাতা ও কাষ্ট খন্ডকে একত্রিত করে আগুন জ্বালাতে শিখেছে। কিন্তু প্রাচীনকালে মানুষ কিভাবে এটার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে সেটা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা এটা ধারণা করতে পারি যে এই পদ্ধতিটি আস্তে আস্তে উন্নতি লাভ করেছে। এর পর

অন্যান্য জ্ঞান গুলোও মানুষ আস্তে আস্তে রপ্ত করেছে। শিখে শিখেই মানুষ তার আজকের অবস্থানে পদার্পন করেছে। সর্ব প্রথম মানুষ এবং প্রথম যুগের মানুষের জ্ঞান সম্পর্কে বর্ণনা আমি করতে পারব কেননা, হযরত আদম আ.-এর জ্ঞান কতটুকু ছিলো সেটা আমরা জানি না। শুধু মাত্র প্রস্থর যুগের মানুষের জ্ঞান কতটুকু ছিলো সেটাই আমরা জানি।

সবচেয়ে আশ্চার্যজনক ব্যাপার হলো ৫০০০ বছরের মানব সভ্যতার ইতিহাসে আমাদের সময় পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান কিভাবে মানুষ রপ্ত করতে পেরেছে? এর সবচেয়ে সহজ-সরল ব্যাখ্যা হলো মানুষের আজকের এই জ্ঞান বিভিন্ন তারিখ ও সালের সাথে রপ্ত করেছে এই ভাবে তারা আজকের জ্ঞান বিজ্ঞান পর্যন্ত আসতে পেরেছে।

কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদেরকে বলে ভিন্ন কথা, ইতিহাস থেকে আমরা শিখতে পারি যে, মানুষের জ্ঞান এইভাবে কোনো নিয়মিত প্রক্রিয়ায় (regular process) আসেনি। তাহলে কিভাবে উন্নতি লাভ করেছে? আমরা যখন অনুসন্ধান করি তখন দেখতে পাই যে প্রাথমিক দিকে মানুষ আস্তে আস্তে /ক্রমধারায় (gradually) জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে এই পদ্ধতিটি ছিলো একটি সময় পর্যন্ত কিন্তু এর পর এটা পর্যায়ক্রমে উন্নীত হয়েছে। তার পর এটা আবার মন্থর হয়ে পড়েছিল, কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছিল কোন সময়ে? জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতি ঘটেছিল মূলত ইসলামের সোনালী যুগ ৭ম শতাব্দীতে আর এই ধারা অব্যাহত ছিলো ১৪ থেকে ১৫ শতাব্দী পর্যন্ত। ইতিহাস স্বাক্ষী জ্ঞান বিজ্ঞান এইভাবে তার উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। ৭ম শতাব্দী থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের এই বিপ্লব মূলত হয়েছিল মুসলিমদের হাতে কিন্তু পরবর্তীতে ইউরোপীয়ানরা মুসলিমদের কাছ থেকে ১৫শ শতাব্দী থেকে দখল করা শুরু করে। এটা শুরু হয় ইউরোপের রেনেঁসার মাধ্যমে এবং ক্রসেডের পর এটা পুরোপুরি তাদের হাতে চলে যায় এবং তারা এর উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। প্রকৃত পক্ষে ইসলামের সোনালী যুগ থেকে রেনেঁসা (৭-১৪) শতাব্দী পর্যন্ত ৭ শত বছর জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় একচ্ছত্রভাবে মুসলিমদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিলো।

তারাই মূলত এই ৭শত বছর জ্ঞান বিজ্ঞানের লালন করত। গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে, আজকে মানুষের কাছে যে জ্ঞান রয়েছে এর ৬০-৭০% ই এসেছে মুসলিমদের কাছ থেকে। মুসলিম মনিষীরাই জ্ঞানের উন্নতি অগ্রগতিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিল। এটা দ্বারা কি বুঝায়? যারা আমাদের সাথে অহমিকা প্রদর্শন করে আমাদের মুসলিম জাতিকে হীন ও নীচু দৃষ্টিতে দেখে তারা জানে না যে তাদের জ্ঞানের ৭০ ভাগের ও বেশি এসেছে মুসলিমদের কাছ থেকে।

www.amarboi.org

এমন অহমিকার মূল কারণ হলো জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা। সত্যিকার অর্থেই কি এমন? অর্থাৎ মুসলিম শাসনামলে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কি এতটাই উন্নতি হয়েছিল? আমি এই কথার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাওয়ার পূর্বে যে দুটি সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করেছিল সে সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ ৩টি বিষয় বলতে চাই। দেখুন ইসলামের সোনালী যুগে মুসলিমদের দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞানে যে উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল সে জ্ঞান মানব কল্যাণে কতটুকু ভূমিকা রেখেছিল অপর পক্ষে ইউরোপীয় রেনেসার সময়ে মুসলিমদের কাছ থেকে যে জ্ঞান তারা আহরণ করেছিল সেটা কিভাবে হয়েছিল। যারা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা বলে থাকে যে, শুধুমাত্র পাশ্চাত্যেই জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছে। তোমরা এই সকল ব্যাপারে অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়েছ। এই কথা বলেই তারা থেমে থাকেনি। পাশ্চাত্যে যারা ইসলাম বিদ্বেষী, ইসলামকে খাট করে প্রকাশ করা যাদের কাজ তারা মানুষের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং তারা কি বলে জানেন?

পাশ্চাত্যবাদীরা তাদের কথাগুলোকে বারবার পুনরাবৃত্তি করে থাকে এই বলে "আপনারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যতটুকু উৎকর্ষতা সাধন করেছেন মুসলিমরা তা করতে পারেনি। তারা প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশরের জ্ঞানকে নেওয়ার পর সেখান থেকে কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং মৌলিক মানবীয় যোগ্যতার বলে সেখানে কিছু উন্নতি করার চেষ্টা করে কিন্তু পরবর্তীতে জ্ঞানের আসল ধারক বাহক ইউরোপীয়ানদের কাছে এটা সমর্পণ করে দেয়।" তাদের এই প্রচার সম্পূর্ণ ভাবেই মিথ্যা। সত্যিকার অর্থে মুসলিমগণ প্রাচীন গ্রীক, ভারতীয় ও মিশরীয়দের কাছ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়েছিল অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কিন্তু এই জ্ঞান নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো।

১. এই তথ্য উপাত্ত্ব কার কোন্ বই থেকে নেওয়া হয়েছে সেটা উল্লেখ করত এবং বলত যে, "(Batlamyus) বাতলামুইসের এই বইটি পড়েছি সেখান থেকে এই তথ্য পেয়েছি। আমরা অকলিড (Oklid) এর এই এই বই কয়টি থেকে একথা জানতে পেরেছি, আমরা পিথাগরাসোর এই বই থেকে এ পেয়েছি" এইভাবে সর্বদাই তথ্যসূত্র দেওয়া থাকত।

২. ইসলামী পন্ডিতগণ প্রাচীন সভ্যতার সাথে সম্পৃক্ত বইগুলোকে পড়ে সেখান থেকে তথ্য উপাত্ত নেওয়ার সময় মুখস্ত করার মাধ্যমে গ্রহণ করেন নাই তারা এটাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার আগ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি।

৩. ইসলামী পন্ডিতগণ যখন প্রাচীন গ্রীক, মিশরীয় ও ভারতীয়দের কাছ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করছিল তখন তারা নিজেরাই জ্ঞান বিজ্ঞানে অন্যদের তুলনায়

উচ্চে অবস্থান করছিল এবং গ্রীক, মিশর ও ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ছিলো অনেক নিচে। তারা জ্ঞান বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণ করার মানসে উন্নত অনুন্নত ভেদাভেদ না করে সকলের কাছ থেকেই জ্ঞান অর্জনে ব্রত ছিলো। এটার দ্বারা কি বুঝায়? এখন আমি আপনাদেরকে এই সম্পর্কে বলতে চাই। ৩য় স্তরে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিমগণ অন্যদের কাছ থেকে জ্ঞান আনয়নের ক্ষেত্রে সকলের জ্ঞানকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অপরপক্ষে ক্রুসেড ছড়িয়ে যাওয়ার পর ইউরোপীয়গণ যখন মুসলিমের সাথে উঠাবসা শুরু করে তখনই মূলত তারা মুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করতে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য।

ক. ইউরোপীয়গণ এই তথ্য উপাত্ত জ্ঞান কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে এর উৎস সম্পর্কে কখনো বলেনি। মুসলিমদের লেখা বইগুলো পড়েছে কিন্তু কার কোন পুস্তক থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে এটা উল্লেখ করেন নাই। অন্যান্য ইউরোপীয়গণ যখন এই সকল বই-পুস্তক পড়েছে তখন তারা ভেবেছে এগুলো ইউরোপীয়ান লেখকদের লেখা পুস্তক। এইভাবে তথ্য বিভ্রাট ছড়িয়ে পড়েছে পুরো ইউরোপ জুড়ে। আমাদের বই পুস্তকগুলোতেও আজ ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের তথ্য উপাত্তকেই পড়ানো হয়। আমরাও মনে করি যে, বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সূত্রগুলো তারাই আবিষ্কার করেছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সত্য কথা হলো তারা এগুলো মুসলিমদের লেখা বই থেকেই পড়ে নিজেদের নামে চালিয়ে দিতো। সত্যিই কি তাই? আমি এগুলোকে প্রমাণ করার জন্য আপনাদের সামনে উদাহরণ পেশ করব।

খ. ইউরোপীয়নরা মুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান নেওয়ার সময় তারা এটাকে না বুঝেই গ্রহণ করেছিল। আজকের এতো উন্নত চোখ ধাধানো ইউরোপ কিভাবে এগুলো না বুঝে গ্রহণ করেছে? এটা হয় কিভাবে? হয়ত এই প্রশ্ন আপনারা আমাকে করবেন। আমি এখন আপনাদেরকে উদাহরণ দিব। আমরা দেখতে পাব তাদের না বুঝা বিষয়গুলো।

গ. ইউরোপীয়গণ যখন এই জ্ঞান বিজ্ঞানগুলো মুসলিমদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল তখন তাদের যোগ্যতা এই জ্ঞানগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ছিলো না। অর্থাৎ ইউরোপীয়ানরা মুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে উপর থেকে নীচে এই নীতিতে জ্ঞান আহরণ করেছে। মুসলিমরা ছিলো উপরে আর ইউরোপীয়ানরা ছিলো নীচে। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিমরা উন্নত ছিলো? ইউরোপীয়ানরা যখন এই জ্ঞানগুলো নিচ্ছিলো তাদের ভাষা এই জ্ঞান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ছিলো না। মুসলিমদের কিতাবগুলো ও কিতাবের পূর্ণ অর্থ গ্রহণে সক্ষম ছিলো না।

১৪ শতাব্দীতে তারা যে সকল সূত্র ও তথ্য উপাত্ত অনুবাদ করেছিল সেগুলো তারা ১৮ শতাব্দীতে এসে বুঝতে শুরু করেছিল। অর্থাৎ ৪ শতাব্দী পর তারা এটাকে অনুধাবন করতে শুরু করেছিল। কিছু কিছু জ্ঞান তার ৫ শতাব্দী পর তারা বুঝতে শুরু করেছিল।

সম্মানিত ভাইয়েরা, সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, মুসলিমগণ অন্যদের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণের সময় এটা কার কাছ থেকে কিভাবে গ্রহণ করছে সেটার তথ্য সূত্রকে উল্লেখ করত। এই সকল জ্ঞান যেমন ছিলো সেভাবেই গ্রহণ করেছিল, ভুলগুলোকে সংশোধন করে গ্রহণ করেছিল, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলোকে উপযোগী করে তুলেছিল। যে সকল জাতি থেকে জ্ঞান নিয়েছিল তাদের থেকে মুসলিমরা ছিলো অনেক উন্নত ও অগ্রগামী। কার কাছ থেকে কি এনেছিল সেটা উল্লেখ করেছিল। তারা এগুলোকে বুঝার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যয় করেছিল।

আমরা এখানে এগুলো কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ ছাড়াই তুলে ধরতে পারছি। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো এগুলোকে ইসলামের শত্রু ও পাশ্চাত্যবাদীদের সামনে তুলে ধরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। আমরা যে ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বল্লাম এর সত্যতা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের। এই দৃষ্টি ভঙ্গির সাথে সম্পৃক্ত কিছু উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমি বলতে চাই যে, আজকে আমরা যেভাবে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বলে অভিহিত করে থাকি, যেমন পদার্থ, রাসায়ন, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল এমনকি আজকের জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল কিছুই মুসলিমদের উদ্ভাবিত। মুসলিমরাই এগুলোর সূচনা করেছে। অবশ্যই ওটি অনেক বড় একটি দাবি কিন্তু আমি এই দাবিকে প্রমাণ করার জন্যে উপস্থিত।

দেখুন উদাহরণস্বরূপ আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চাঁদে এবং মহাকাশে যাওয়া। মহাকাশ ও চাঁদে যাওয়ার যে বিষয় সেটি জ্যোতিবিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত একটি জ্ঞান এবং আমরা জানি যে, জ্যোর্তিবিদ্যার জ্ঞান মূলত উদ্ভাবিত হয়েছিল মুসলিমদের মাধ্যমে। যে মুসলিম এই জ্ঞানের জনক কে তিনি? আমি আপনাদেরকে এগুলো থেকে শুধুমাত্র কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করব। ইসলামের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম হলেন আল বাত্তানী ইসমাইলি। তিনি হলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন জ্যোতিবিজ্ঞানী। আল-বাত্তানী কে? আপনারা কি জানেন কে তিনি? হয়ত আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জেনে থাকবেন। দু:খ জনক হলেও সত্য যে, আমরা আমাদের বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে জানি না, আমাদেরকে আমাদের প্রেরণার উৎস

মুসলিম বিজ্ঞান সম্পর্কে শেখানো হয় না। আমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই বাতলামাউস (Batlamyus) এর নাম জানেন। তাকে অনেকেই পতলেমে (Ptoleme) নামে চিনে। কেন? কেননা আমাদের বই পুস্তকে তাদের সম্পর্কে লেখা হয়, তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু আল-বাত্তানীর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হয় না। কেন? এর পেছনে মূল কারণ হলো আমাদের বই পুস্তকগুলোর অধিকাংশই পাশ্চাত্যের বই পুস্তকগুলো থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। তথাপি বাতলামাউস (Batlamyus) এর অবস্থান কোথায় আর আল-বাত্তানী কোথায়? বিজ্ঞানে এই ২জনের মধ্যে কার অবস্থান কত উপরে সেটা আপনাদের সামনে প্রকাশ করব। আল বাত্তানীর পূর্বে মিশরীয় বিজ্ঞানী বাতলামাউস (Batlamyus) মহাকাশে সূর্যের প্রদক্ষিণ সম্পর্কে একটি ধারণা পেশ করেছিলেন সেটা হলো মহাকাশে সূর্য তার নিজস্ব জায়গায় ফিরে আসতে ২৬০ দিন লাগে অর্থ বছরে ২৬০ দিন।

কিন্তু আল বাত্তানী তার এই কথাকে ভুল প্রমাণ করে বলেন যে সূর্য তার একই অবস্থানে ফিরে আসতে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড লাগে। অর্থাৎ এক বছর মানে হল ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড। এখন পাশ্চাত্য কি আমাদেরকে এটা বলতে পারবে যে, আল বাত্তানী এবং বাতলামাউস এর গবেষণার মাঝে খুব সামান্য পার্থক্য রয়েছে। আল-বাত্তানী যে হিসাব আমাদের সামনে পেশ করেছেন আজকের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে হিসাব বের করা হয়েছে তার সাথে মাত্র ২ মিনিট ২৪ সেকেন্ড এর পার্থক্য রয়েছে। আল বাত্তানী এতো বছর পূর্বে আমাদের সামনে এতো নিখুত একটি হিসাব করে দেখিয়েছেন। আচ্ছা যে ব্যক্তি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে ২৬০ দিনে এক বছর আর যিনি বলেছেন যে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড ২জনের অবস্থান কি একই? আমরা এরকম পার্থক্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। কেন? কারণ হলো মুসলিমগণ জ্ঞান বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধন করার পর (Batlamyus) বাতলামাউস এর মতো বিজ্ঞানেও ইতিহাসের পেছনে পড়ে থাকবেন।

প্রাচীন মিশরীয়রা ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ মেরসিন থেকে ইসকেনদেরীয়া এর দূরত্ব তারা মেপেছিল আজকের দূরত্ব থেকে ২০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ আনকারা থেকে কনিয়ার দূরত্ব ২৬০ কিলোমিটার কিন্তু তারা ভাবত যে ১৩ কিলোমিটার কিন্তু যখন মুসলিমরা ক্ষমতা পায় তখন তারা ভূমধ্য সাগরের সঠিক দৈর্ঘ্য বের করতে সক্ষম হয়। কিভাবে তারা পরিমাপ করেছিল? আব্বাসীয় খলিফা মামুন নির্দেশ প্রদান করেন যে,"ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত মুসলিম জনগণের ভূমির তফসিলভূক্ত জরিপ ও সেখানে অবস্থিত মুসলিম জনগণের অধিকার নিরূপন করতে চাই। ভূমধ্য সাগরের তীরে অবস্থানরত মুসলিম জনগন ও তীরের দৈর্ঘ্য

সঠিকভাবে নির্ণয় করে আমার কাছে নিয়ে আসবে"। এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি একদল ভূগোল বিজ্ঞানীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ সেই সময়ের সকল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ভূমধ্য সাগরের প্রস্থ মাপার জন্য একটি পথ অনুসরণ করেন : তারা ভূমধ্য সাগরের তীরে গড়ে উঠা একটি শহর থেকে পরিমাপ করার কাজ শুরু করে। তারা উচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেই চূড়া থেকে যতটকু দেখতে পারে ততটুকু পর্যন্ত তারা দেখে। এরপর তারা সাগরের উচ্চতায় পাহাড়ের চূড়ার উচ্চতাকে পরিমাপ করে। সূর্য ডোবার সময় পাহাড়ের চূড়া থেকে সেই সময়ের যন্ত্রপাতি দিয়ে এর মধ্যকার কোনকে পরিমাপ করে। যদি আরও সহজভাবে একটি উদাহরণ পেশ করি তাহলে যেমন ধরুন কনিয়াতে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম, দেখি কি কুলের ওখানে সূর্য অস্ত হচ্ছে। সূর্য সেখানে কত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ডুবছে সেটার একটা পরিমাপ করি। যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি তার উচ্চতা মেপে নেই।

পাহাড়ের উচ্চতা মাপার পরও সূর্য কত ডিগ্রী কোনে ডুবলো সেটা জানার পর পাহাড় থেকে কুলের (একটি জায়গার নাম) দূরত্ব জেনে নেই। অর্থাৎ কুলে থেকে কনিয়ার দূরত্ব হিসাব করছি। কিভাবে? হিসাব করি? শুধুমাত্র এটাকে হিসাব করার জন্য আজকে যে আমরা (sine) সাইন, (cosine)কোসাইন, (tangent)টেনজেন্ট ব্যবহার করি এই ত্রিকোনমিতির ধারণা আবিষ্কার করে হিসাব করা হলো। ত্রিকোনমিতির এই ধারণা সর্বপ্রথম খলিফা মামুনের সময়ে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করেন। তারা এই দূরত্ব হিসাব করার সময় বিপরীত কোনের সাইন (sine) ও কোসাইন (cosine) হিসাব করে এবং এই হিসাবের দ্বারা তারা দূরত্ব পরিমাপ করতে সক্ষম হয়। আমরা সাইন (sine) সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করব।

শুধুমাত্র ভূমধ্য সাগরের প্রস্থ কিভাবে মেপেছিল সে সম্পর্কে বলতে চাই। এখান থেকে যাওয়ার কুলুর পাহাড়ের চূড়ায় উঠার পর সেখান থেকে আনকারার দিকে তাকায়। এরপর দুই পাহাড়ের মাঝখানের দূরত্ব মেপে এইভাবে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে উঠে শহরের মাঝখানের সকল দূরত্বকে মেপে মেপে ভূমধ্য সাগরের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে পরিমাপ করে। প্রাচীন মিসরীয়রা ভূমধ্য সাগরের দৈর্ঘ্য আজকের দৈর্ঘ্য থেকে ২০ ভাগের ১ ভাগ ভাবত। কিন্তু মুসলিমরা সকল অসম্ভাবনাকে সম্ভব করে সত্যিকারের দূরত্ব মাপতে পেরেছিল।

এখন আসি সাইন (sine) এর কথায়। যে সকল ভাইয়েরা তুলনামূলকভাবে আগে ত্রিকোনমিতি পড়েছেন তারা জানেন যে, আগে ত্রিকোনমিতি পড়ার সময় sine, cosine এ সকল শব্দের জায়গায় zeyp, শব্দ ব্যবহৃত হত। zeyp শব্দটি

একটি আরবি শব্দ। খলিফা মামুনের সময় সর্বপ্রথম মুসলিম বিজ্ঞানীগণ দূরত্ব পরিমাপ করার ক্ষেত্রে এই শব্দগুলোর ব্যবহার করেছিলেন। সে সময়ের মানুষগণ দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার জন্য দৈর্ঘ্যকে জেপ (zeyp) এর সাথে তুলনা করেছিলেন। এই জেপ (zeyp) আমাদের তারকিশ ভাষায় ব্যবহৃত জেপ (zeyp) জেপ (zeyp) নয়। হিসাব করার সময় বই পুস্তকে "zeyp down, zeyp above" এরকম অনেক হিসাব করা হতো। ক্রুসেড এরপর ইউরোপীয়ানরা এই সকল বই পুস্তক পেতে শুরু করে এবং দেখে এরা ভূমধ্যসাগরের প্রস্থ অসাধারণ সঠিকভাবে পরিমাপ করেছে। গাণিতিক হিসাব গুলোতে zeyp এর মতো শব্দ থাকায় এ হিসাব তারা ধরতে ও বুঝতে পারেনি।

এ হিসাবগুলোকে বুঝার জন্য অভিধানের সাহায্য নিয়েছে, আরবিতে জেপ (zeyp) শব্দের ল্যাটিন হলো সাইন (sine) তারা এই ল্যাটিন শব্দকে ব্যবহার করেছে। ইউরোপীয়ানরা এটাকে sine (সাইন) বলার কারণে আমরাও যেহেতু ইউরোপ থেকে সবকিছু আমদানি করছি, সেহেতু আমাদের উদ্ভাবিত শব্দকে তারা না বুঝার কারণে তারা তাদের বুঝার স্বার্থে যে শব্দ ব্যবহার করেছে আমরাও আমাদের পাঠ্য পুস্তকে তাদের অভিহিত করা নামে আমরাও পড়ছি ও পড়াচ্ছি। এই জন্যই sine, cosine এই শব্দগুলি ব্যবহার করছি। শুধু কি তাই এগুলো যারা পড়ছেন পড়াচ্ছেন তারা সবাই মুসলিম। সম্পদের আসল মালিক হলো মুসলিম, ইউরোপীয়ানরা আমাদের কাছ থেকে না বুঝে নিয়েছিল আমরাও না বুঝে ইউরোপীয়ানদের নিকট থেকে আনছি।

মুসলিমদের ইতিহাস এ রকম আবিষ্কারে পরিপূর্ণ। শুধু এগুলোই নয়, মুসলিমরা আজকের ভূগোলের যে পরিমাপ এটারও আবিষ্কারক। খলিফা মামুনের সময়ে হাররান এলাকা আমাদের তুরস্ক থেকে ইরাক এর বিভিন্ন শহর পর্যন্ত দূরত্বের পরিমাপ করেছিলেন। আজকে আমরা জানি যে, ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব ১১১,০০০ কিলোমিটার। সেটা খলিফা মামুনের সময়েই মুসলিমরা পরিমাপ করেছিল। আর তারা যে পরিমাপ করেছিল সেটাও ছিলো ১১১,০০০ কিলোমিটার।

এখানেই শেষ নয়, মুসলিমরা সাইনাস টেবিল (sinus table) ও আবিষ্কার করেছিল। এই sinus table (সাইনাস টেবিল) আজকে আমরা ব্যবহার করে থাকি। এমনকি এগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আর এগুলো ছাপা হয়েছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। আর আমরা খুবই হীনমন্যভাবে ধারণা করি যে, এ সকল পুস্তকের সকল হিসাব নিকাশ ও সূত্রাবলী ইউরোপীয়ানদের আবিষ্কার। অথচ সর্বপ্রথম ত্রিকোনমিতি টেবিল সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিল মুসলিমগণ। গিয়াসউদ্দিন জামশেদ তিনি

www.amarboi.org

খোরাসানের বাসিন্দা ছিলেন। তিনিও হলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি তার গ্রন্থ রিসালাতুল-মুহিতিয়েতে সর্ব প্রথম (sinus) সাইনাস এর হিসাব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। এখন চলুন পুনরায় আমরা পাশ্চাত্যের ইউরোপীয় মদদপুষ্টদের জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যে বল মুসলিমরা গ্রীক ও মিশরীয়দের থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়েছে। মিশরীয়দের মাঝে সাইনাস (sinus) এর ধারণা কোথায়? কোথায় তাদের মাঝে ত্রিকোনমিতির ধারণা? মিশরীয়দের মাঝে এসকল কিছুর বিন্দুমাত্রও ধারণা পাওয়া যায়না। কিন্তু দেখুন গিয়াসউদ্দিন জামশেদ কিভাবে (sinus) এর ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন। D, 017452 404 437 238 371. তিনি সাইন এক ডিগ্রী এর ধারণাকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, কমার পরে ১৬টি সংখ্যাকে তিনি সাইন (sin) এক ডিগ্রীশে গণনা করতে পেরেছেন। এই হিসাব যখন আজকে আমরা ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটরে করি তখন একই ফলাফল আমরা পেয়ে থাকি। গিয়াসউদ্দিন জামশেদ ত্রিকোনমিতির এই টেবিলকে/পরিমাপকে এ পদ্ধতিতে উদ্ভাবন করেছেন।

কিভাবে তিনি এটা করেছেন? তারা কিভাবে একাজ এ হিসাব নিকাশগুলো করেছেন এই চিন্তা যখন করি তখন আমরা অবাক হয়ে যাই। আমরা যখন তাদের জ্ঞান গরিমার এই উপমা দেখতে পাই তখন তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ন্তর দেখিনা। একইভাবে যদি আমরা ইউরোপীয়ানদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি যে, পাই (π) এর সংখ্যার ধারণার আবিষ্কারক কে? তারা নিশ্চিত করেই এটা বলবে যে এটা প্রাচীন গ্রীকদের আবিষ্কার। না, পাই (π) এর সংখ্যার আবিষ্কারক ও এর সর্বপ্রথম ধারণা দান করেন মুসলিমগণ। আর গিয়াসউদ্দিন জামশেদ এর রচিত বই রিসালাতুল মুহিতিয়া থেকে এর সম্পর্কে আপনাদের জানাতে চাই। গিয়াসউদ্দিন জামশেদ পাই (π) এর মান হিসাবে এই সংখ্যাগুলো উদ্ভাবন করেন: 3.141592635589743। অর্থাৎ পাই (π) এর মান কমার পরে ১৫টি সংখ্যার মাধ্যমে সঠিকভাবে আবিষ্কার করেছেন। আজকে আমরা যখন ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করি আমরা এই সংখ্যার কোনো ব্যতিক্রম পাই না। কেননা ইসলামের সোনালী যুগে সকল জ্ঞান বিজ্ঞান মুসলিমদের হাতে উন্নতি লাভ করে এবং জ্ঞানের সত্যিকারের প্রসারণ শুরু হয়।

মুসলিমরা শুধুমাত্র জ্যোতিবিদ্যা ও ত্রিকোনমিতিই আবিষ্কার করেনি। আজকের বীজগণিতের আবিষ্কারক হলেন মুসলিমগণ। আজকে আমাদের সামনে যে গণিত শাস্ত্র রয়েছে এর মূলনীতির উদ্ভাবক হলেন মুসলিম গণিত বিশারদগণ। দেখুন যারা আমাদের পাশে এসে গর্ব অহংকার করে বলে যে, আমরা চাঁদে যাই আমরা মহাকাশ পরিভ্রমন করি। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করি আপনারা হিসাব

কিভাবে করেন? এই প্রশ্ন করার পর যে কিছু সংখ্যা লিখবে। আমরা যেরূপ জানি ১,২,৩,...৯ এরকম সংখ্যাগুলোই সে লিখবে। কিন্তু এ সংখ্যাগুলোর ও আবিষ্কারক মুসলিমগণ, সংখ্যাগুলোর আকৃতি মুসলিমদের দেওয়া। ইউরোপীয়ানরা এই সংখ্যাগুলোর যে আকৃতি ব্যবহার করে সে আকৃতি ইউরোপ আমেরিকাতে অবস্থানরত মুসলিমদের ব্যবহৃত সংখ্যাগুলোর ন্যায়। আরও যদি সামনের দিকে যাই তাহলেও দেখতে পাই যে, যে মানুষগুলো আমাদেরকে তাদের চোখে নীচু ও হীন দেখতে অভ্যস্ত তাদের হিসাবের পদ্ধতির ও আবিষ্কারক মুসলিমগণ। এটা কিভাবে হয়েছিল? লক্ষ্য করুন পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ বলে থাকে যে মুসলিমগণ প্রাচীন গ্রীক ভারতীয় ও মিশরীয়দের কাছ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান গ্রহণ করেন। এটা কেমন জ্ঞান আহরণ গ্রীকদের সংখ্যার ধারণায় ৬০ এর অধিক কোনো সংখ্যা ছিলো না।

তাদের ভাষার যতগুলো হরফ ছিলো ততগুলোই ছিলো তাদের সংখ্যা অর্থাৎ হরফ শেষ হলে সংখ্যাও শেষ হতো। এরপর যখন মুসলিমদের হাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত শুরু হয় তখন মুসলিমরা বলেন যে, আমাদের বিশাল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আপনাদের সংখ্যার সীমাবদ্ধতা যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ আমরা নতুন সংখ্যা আবিষ্কার করব। কি আবিষ্কার করবেন? উত্তর হিসাবে বলেছিলেন যে, এমন একটি সংখ্যা আবিষ্কার করব যে সংখ্যা দিয়ে যতো বড় ইচ্ছা ততো বড় গাণিতিক সংখ্যার সমাধান করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ এক সংখ্যাটি লিখলাম। এটাকে যদি (১) এই গঠনে গঠন করি এবং এরপর যদি দুটি শূন্য (০০) বসাই তাহলে এটি হতে শতক তিনটি শূন্য বসালে হবে (১০০০) হাজারে এভাবে যতো ইচ্ছা শূণ্য বসানো সম্ভব। এ সকল সংখ্যার মাধ্যমে যতো ইচ্ছা গাণিতিক সংখ্যা লেখা সম্ভব। শুধু এখানেই শেষ নয়।

এই সংখ্যা আবিষ্কার করার পর আজকের গুণ, ভাগ, যোগ, বিয়োগ এর পদ্ধতিও আবিষ্কার করে মুসলিমরা। প্রাচীন গ্রীক ও মিশরীয়রা কিন্তু গুণ, ভাগ, যোগ, বিয়োগ এই পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত ছিলো না। কেননা তাদের সংখ্যার পদ্ধতি এই পদ্ধতির জন্য উপযোগী ছিলো না। তারা যোগ বিয়োগ করার জন্য বিভিন্ন কাঠিকে ব্যবহার করত। মুসলিমগণ এগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে এগুলো গণিতের জন্য উপযোগী নয়। তখন তা তারা নতুন সংখ্যার উদ্ভাবন করে এই পদ্ধতিকে চালু করে। দশক সংখ্যার এই পদ্ধতির আবিষ্কার নি:সন্দেহে মানব জাতির জন্য একটি অনেক বড় খেদমত।

মুসলিমরা যদি শুধুমাত্র বলে যে, 'তোমরা আমাদের উদ্ভাবিত সকল কিছুই ব্যবহার করতে পার শুধু আমাদের উদ্ভাবিত সংখ্যা ব্যবহার করবে না'একথা যদি বলা হয় তাহলে ইউরোপীয়ানরা তাদের উদ্ভাবন আর ধরে রাখতে পারবে না।

এমনকি তারা নতুন আবিষ্কারের দিকেও এগোতে পারবে না। অথচ তারা আমাদের কাছে এসে গর্বে বুক ফুলিয়ে বলে যে ইসলাম হলো মধ্যযুগীয় একটি ধারণা। বর্তমানে এটি মানব সভ্যতাও মানব কল্যাণের উপযোগী নয়। হ্যা আমরা আমাদের মধ্যযুগীয় ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট, আপনারা আমাদের সকল সম্পদ ফিরত দিন, আমাদের মধ্যযুগের উদ্ভাবন আপনারা কেন ব্যবহার করছেন? আপনারা আমাদের উদ্ভাবন ব্যবহার করবেন না। আমরাও আপনাদের তথা কথিত নতুন উদ্ভাবন এগুলোও ব্যবহার করব না। আমরা আমাদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন দিয়ে আপনাদের চেয়েও উন্নত ও সোনালী সমাজ গড়ে তুলতে পারি যেমনিভাবে অতীতে পেরেছিলাম। গাণিতিক বিপ্লব ও বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কার মুসলিমগণ গোটা মানব সভ্যতাকে উপহার হিসাবে পেশ করেছেন। কিন্তু আমরা নিজের অতীত ইতিহাস ভুলে অন্যকে অনুসরণ করছি।

মুসলিমদের আবিষ্কার এখানেই শেষ নয়। আল জেবরা বা বীজগণিতের আবিষ্কারক ও মুসলিমগণ। "জেবির" অর্থাৎ বীজ গণিত বলতে কি বুঝায়? জেবির শব্দটি ও মুসলিম গণিতবীদ আল-জাবির এর নাম থেকে নেয়া হয়েছে। ইউরোপীয়ানরা এই নামটিকেও তাদের মুখে উচ্চারণ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারেনি। তারা এই মহান ব্যক্তির নামকে লুকানোর লক্ষে তার নামকে বিকৃত করে তাদের সকল পুস্তকে তার প্রণীত গণিতকে আল-জেব্রা নামে অবহিত করে। আজ ইউরোপের ইংল্যান্ড ও জার্মানির সকল স্কুলে গণিতের বইগুলোকে আল-জেব্রা নামে অবিহিত করা হয়। আর আমরাও বীজ গণিতকে আল-জেব্রা নামে অবিহিত করে থাকি।

কে এই বীজ গণিতের আবিষ্কারক? অবশ্যই মুসলিমগণ। কি করেছিল আল জাবির? জাবির যা করেছিলেন সেটা হলো প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয়দের গণিতকে তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তিনি পাশ্চাত্যের মতো তাদের থেকে নেওয়া জ্ঞানগুলোকে নিজের বলে দাবি করেননি। তা হলে তিনি কি করেছেন? তিনি যখন তাদের গণিতগুলোকে পর্যালোচনা করলেন তখন দেখতে পেলেন যে তারা ত্রিভূজ ও কিছু নকশার মাধ্যমে তাদের গাণিতিক সমস্যাকে সমাধান করে থাকেন। কান প্রাচীন গ্রীক ও মিশরীয়দের নিকট বীজগণিতের কোনো ধারণা ছিলো না। গাণিতিক সূত্রগুলোকে বর্ণমালার মাধ্যমে প্রকাশ করে আজকের এই বীজগণিতের ধারণার প্রবর্তন করেন।

যারা আজকে আমাদের সাথে দম্ভ করে কথা বলে তারা জানে না যে, বীজগণিতের উদ্ভাবকও মুসলিমগণ অর্থাৎ আল-জাবির। একটি সমীকরণের উভয় পক্ষে যদি যোগ করা হয়, গুণ করা হয় অথবা ভাগ করা হয় এই সমীকরণ এর কোনো পরিবর্তন হবে না। এটারও আবিষ্কারক হলেন আল জাবির। জাবির

কি করেছেন? তিনি একই সাথে সমীকরণ দ্বিঘাত সমীকরণ ও ত্রিঘাত সমীকরণ এরও সমাধান দিয়েছেন তার রচিত বইয়ে। অপরপক্ষে বর্গ এর সাথে সম্পৃক্ত অনেক সমীকরণ ত্রিঘাত সমীকরণ দিয়ে সমাধান করা যায় না। কিন্তু ইসলামের সোনালী যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান যখন মুসলিম উৎকর্ষের শীর্ষে তখন তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম গণিতবিদ আল জাবির ত্রিঘাত সমীকরণ এর মাধ্যমে কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা তিনি দেখিয়েছেন এবং সে সাথে ঘনমূল (cube root) কে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সেটাও তিনি সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন। এগুলো এতটাই উন্নতমানের ছিলো যে, তারা পুরাতন জ্ঞান বিজ্ঞানকে ঢেলে নতুন করে সাজিয়েছিলেন। আর এটা করেছিলেন দূরদর্শী মুসলিমগণ।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন "তোমরা মুমিনের দূরদৃষ্টিকে ভয় কর, কেননা সে আল্লাহ তায়ালার নূরের মাধ্যমে দেখে থাকে "اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله" তাদের এই দৃষ্টি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক যে ছিলো সেটাও না। বরং এটা বাস্তবিক ও প্রকাশ্যেই ছিলো ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের জ্ঞান গবেষণার দিকে যখন আমরা তাকাই তখন আমাদের বিবেকের বুদ্ধি থমকে দাঁড়ায়। তারা এতো বড় বড় অসাধ্য কিভাবে সম্ভব করেছিল তার দিকে তাকিয়ে আমরা আশ্চার্য হয়ে যাই সেই সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনো আল জাবির জ্ঞানের ক্ষেত্রে আর আসেনি। যারা নজিদেরকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক বলে মনে করে তারা এরকম আল জাবির আমাদের সামনে পেশ করুন দেখি...

আমরা যে শূণ্য (০) ব্যবহার করে থাকি এ ধারণাও মুসলিমরা উদ্ভাবন করেছেন। আজকের যে বীজগণিতের উচ্চ পর্যায়ে লিমিট (limit) পড়ানো হয় এটাও মুসলিমদের উদ্ভাবন। আমরা লাগারিদম (logarithem) বলে যেটা জানি এটাও মুসলিমদের আবিষ্কার। লাগারিদম এর সকল সূত্রাবলী সর্ব প্রথম আল-হারজেম (Al-Harzem) নামক মুসলিম বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন।

মুসলিমরা এই সকল গণিতকে উদ্ভাবন করেছেন। অপর দিকে ইতিহাস, পদার্থ, রসায়নেরও জনক মুসলিমগণ। আচ্ছা মুসলিমরা পদার্থ বিজ্ঞানে কি অবদান রেখেছিলেন? পশ্চাত্যরা যেভাবে বলে থাকে তোমরা সব প্রাচীন গ্রীক থেকে নিয়েছে। আমি একটা উপমার মাধ্যমে বুঝাতে চাই, আজকে পদার্থ বিজ্ঞানের জনক হলেন ইবনে হেইশাম (Ibni Heysam) আমি যা জিজ্ঞাসা করি তিনি কে ছিলেন, তাহলে কেউ তার সম্পর্কে বলতে পারবে না। অথচ তার রচিত বই আমরা অনেকেই স্কুল কলেজে পড়েছি। কিন্তু ইবনে হাইশেম এর নামসহ আমাদেরকে পড়ানো হয়নি। কিন্তু তিনি হলেন পদার্থ বিজ্ঞানের জনক।

অপরদিকে ইবনে হেইশাম (Ibni Heysam) আজকের পরমাণু (Atom) ও অণুর সর্বপ্রথম ধারণা প্রদান করেছিলেন। তিনি আলোর প্রতিসরণ এর সূত্র আবিষ্কার করেন। প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানী অকলিত এর মতে "যখন কোনো আলোকরশ্মি একটি ত্রিপাশ্ব কাঁচ (prism) ভেদ করে তখন আলোক রশ্মির গতি কমে যায় এবং এর কমার হার প্রতিসরণের সমানুপাতিক প্রতি শব্দ কোনের সমানুপাতিক। কিন্তু ইবনে হেইসেম (Heysem) বলেন এর কমার হার প্রতিসরণ কোণের সমানুপাতিক নয়। বরং এটি প্রতিসরণ কোণের সাইনের সমানুপাতিক।গতির হ্রাস পাওয়া বস্তুর সমানুপাতিক। এবং বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয়টি তিনি পরমানু সুত্রের আলোকে সম্পন্ন করেন।

রসায়ন বিজ্ঞানের জনক হলেন মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। এর জনক হলেন জাবের ইবনে হাইয়্যান। তিনি সর্বপ্রথম (Fission of Atom) পরমাণু কে বিভক্ত করা যেতে পারে এ ধারণা প্রদান করেছিলেন। হিজরী ২য় শতাব্দীতে তিনি শ্রেষ্ঠ একজন বিজ্ঞানী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রসায়ন (Chemestry) বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। পরমাণু তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আজকে আমাদের পুস্তকে (Lavoisi) লাভোইস ও নিউটনের যে সূত্রগুলো পড়ানো হয় এগুলো তিনি বহু শতাব্দী আগে উদ্ভাবন করেছিলেন। ইউরোপীয়নদের আবিষ্কারের ১০০০ বছর পূর্বে তিনি এগুলো উদ্ভাবন করেছিলেন। জাবির ইবনে হাইয়্যান হলেন ৮ম শতাব্দীর বিজ্ঞানী। অন্যদিকে নিউটন ১৯ শতাব্দীতে ইউরোপে সূত্রগুলোর ধারণা প্রদান করেন। মধ্যাকর্ষণ শক্তির ধারণা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন জাবির ইবনে হাইয়্যান এটা কিভাবে আমরা জানি? অতি সম্প্রতি জার্মানিতে ৪খন্ডে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, এই বইতে জাবির ইবনে হাইয়্যান এর বইয়ের ফটোকপি সংযুক্ত করা হয়েছে। ঐ বইয়ের মাধ্যমে সকলেই এই ব্যাপারে জানতে ও দেখতে পারবে। ইউরোপীয়রা ১৪শ শতাব্দীতে জাবির ইবনে হাইয়্যান এর বইকে অনুধাবন করেছিল।

কিন্তু তারা এটা বুঝতে পেরেছে ১৬ শতাব্দীতে এবং লাভইসির (lavoisi) সূত্রনামে প্রকাশ করে। অন্যটা ১৭শ শতাব্দীতে বুঝতে পেরেছে সেটাকে গেই লুসাক (Gay lussac) এর সূত্র নামে প্রকাশ করেছে এবং ১৯শ শতাব্দীতে যখন মধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাখ্যা বুঝতে পেরেছে তখন এটাকে নিউটনের সূত্র ও আবিষ্কার বলে প্রকাশ করেছে। জাবির ইবনে হাইয়্যান সর্বপ্রথম বিজ্ঞানাগারের ধারণার প্রবর্তক। তিনি সর্বপ্রথম পরিমাপ (measurement) এবং পরীক্ষা (exper) এর উদ্ভাবন করেন। তিনি সর্বপ্রথম একটি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপীয়ানরা এখনো সেই মানের কোনো বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অবশ্যই আমরা যখন এখানে আসি তখন আমাদের বুদ্ধি বিবেক থমকে দাঁড়ায়।

www.amarboi.org

কিন্তু জাবির বিন হাইয়্যান হিজরী ২য় শতাব্দীর জ্ঞানকে এতো উৎকর্ষতায় উন্নীত করেছিলেন। আজকে জার্মানিতে জাবির ইবনে হাইয়্যানকে নিয়ে ডক্টরেট করা হচ্ছে। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য, পশ্চিমারা আমাদের বিজ্ঞানীদের লেখা বই গুলোকে নিয়ে তাদের নামকে গোপন করে, তাদের নিজস্ব অমুসলিম বিজ্ঞানীদের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। আর আমরাও তাদের রচিত বই গুলোকে অনুবাদ করে তাদের বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে জানাচ্ছি এবং সকল আবিষ্কার তাদের বলে ধারণা করছি আর আমাদের মহান বিজ্ঞানীগণ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছি। মুসলিমগণ সঠিক ইতিহাসের সন্ধান বিশ্ববাসীকে দিয়েছে। ভূগোল এর আবিষ্কারও করেছে মুসলিমগণ। অতীতে ইতিহাস ছিলো উপন্যাস নির্ভর। ইবনে খালদুন হলেন সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক যিনি ইতিহাসকে উপন্যাস ধারা থেকে বের করে নিয়ে আসেঃ ইতিহাস কোনো উপন্যাস হতে পারে না। ইতিহাস হলো সকল মানুষ ও সকল জাতির পতন ও বসবাস করার কাহিনী এগুলো বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে এটি যে একটি জ্ঞানের অন্যতম শাখা এবং এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম ইতিহাসের পুস্তক রচনাকারী হলেন ইবনে খালদুন এবং তিনি সর্বপ্রথম ভৌগলিক মানচিত্র আবিষ্কার করেন। এমনকি আমেরিকারও আবিষ্কার সর্বপ্রথম মুসলিমরাই করেছিলেন।

মুসলিমদের প্রস্তুতকৃত মানচিত্রে আমেরিকার অস্তিত্ব দেখা হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি যে আমেরিকাকে আবিষ্কার করেছেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস। কেনই আমরা সব কিছুই এরকম জানি? কারণ হলো আমরা সকল তথ্য উপাত্ত্ব ইউরোপীয়ানদের থেকে আমদানী করি বলেই এই অবস্থা। দেখুন ক্রিস্টোফার কলম্বাস সম্পর্কে নতুন করে অনুদ্ধান কি বলে? ক্রিস্টোফার কলম্বাস ছিলেন একজন ভেনেডিষ্ট (venedians) অর্থাৎ তিনি বনিকদের জাহাজের মাধ্যমে মুসলিম দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক তৈরি করেন। অনেক মুসলিম তাদের বই পুস্তক ভেনেডিয়ান (venedian) ও জেনিভিজ (Genovese) ভাষায় অনুবাদ করে সেখানে ইন্তেকাল করেন। ক্রিস্টোফার কলম্বাস মুসলিমদের সেই সকল বই থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন যে, যদি পশ্চিমের দিকে সোজা যাওয়া যেতে পারে তাহলে সে নতুন মহাদেশের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই জন্য সে, এই ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে প্রথম বারের মতো আটলান্টিক এর বুকে পাড়ি জমান। ক্রিস্টোফার কলম্বাস মাসের পর মাস পশ্চিম দিকে যেতে থাকে কিন্তু কোনো স্থলভূমি খুজে পাননা। অবশেষে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে জাহাজের অভ্যন্ত রের তার সাথীগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে।

তারা বলতে থাকে যে আমরা ফিরে যাব। তুমি নিজেও জান না আমাদেরকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে যাচ্ছ। এই যাত্রার কোনো ফলাফল পাওয়া যাবে

www.amarboi.org

না। তাদের এই ক্ষোভকে দমন করার জন্য ক্রিস্টোফার কলম্বাস এই কথা বলে তাদেরকে নিবৃত্ত করেন যে "দু:চিন্তা গ্রস্থ হয়োনা, এইভাবে বলনা। আমি যদি সঠিকভাবে পশ্চিম দিকে যাই তাহলে যে, নতুন ভূমির সন্ধান পাব এই চিন্তাও তথ্য মুসলিমদের রচিত বই থেকে জানতে পেরেছি। সে ভূমিতে আমরা অবশ্যই পৌছতে পারব। কারণ মুসলিমরা কখনো মিথ্যা বলতে পারে না।" এর পর তারা সকলেই ধৈর্য ধারণ করে সেই পথে যেতে থাকে। অবশেষে তারা আমেরিকা মহাদেশের সন্ধান লাভ করে।

ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থ, রসায়ন, গণিত, বীজগণিত (আল জেবরা) সহ জ্ঞান বিজ্ঞানর প্রতিটি শাখায় মুসলিমদের অসামান্য অবদান রয়েছে। আর এই জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন মুসলিমগণ। ইউরোপীয়ানরা এই জ্ঞান কিভাবে মুসলিমদের কাছ থেকে নিয়েছিল? একটু পর এখানে আসব: ইউরোপীয়ানরা মুসলিমদের সাথে ক্রুসেড এর সময় মুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞানগুলো নিয়ে আস্তে তাদের নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করে শিখতে শুরু করে। কিন্তু প্রথম দিকে তারা এই জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারেনি। ফ্রান্স যখন স্পেন এর বিভিন্ন শহর দখল করে নেয় তখন তারা সেই সকল শহরের মুসলিম বিজ্ঞানীদের গড়ে তোলা সকল লাইব্রেরীকে পুড়িয়ে দেয়। শুধু মাত্র কর্ডোভা শহরের কেন্দ্র বিন্দুতে ত্রিশ হাজার বিজ্ঞানের কিতাবকে পুড়িয়ে দেয়। হালাকু খান যখন আক্রমণ করে তখন বাগদাদের সকল লাইব্রেরীর বই গুলোকে টাইগ্রীস ও ফোরাত নদীতে নিক্ষেপ করে।

টাইগ্রীস ও ফোরাত এর মতো খরস্রোতা নদীতে এই বইগুলা প্রবাহিত হতে ১ সপ্তাহের মতো সময় লাগে। ফ্রান্স যখন স্পেনে হামলা করে স্পেনকে দখল করে নেয় তখন তারা বিভিন্ন ইসলামীক জ্ঞান-গবেষণা সেন্টারের তাৎপর্য বুঝতে পারেনি এবং পরবর্তীতে যখন তারা এটা বুঝতে পেরেছিল তখন তারা নিজেদের মধ্যে মুসলিমদের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। তারা এতটাই মুসলিমদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যে, ২০০ শত বছর পূর্বেও প্যারিস এর সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ মুসলিমদের ন্যায় জুব্বা পরিধান করত, মাথায় টুপি, পাগড়ি পড়ত এমনকি তারা সর্বান্তকরণে মুসলিম বিজ্ঞানীদের ন্যায় হওয়ার চেষ্টা করত। এটা এজন্য করত যে, "জ্ঞান বিজ্ঞান উৎকর্ষ সাধন করেছে মুসলিমরা তাই আমরাও যদি তাদের মতো বিজ্ঞানী হতে চাই তাহলে আমাদেরকেও সব দিক থেকে তাদের মতো হতে হবে" একথা তারা বলত।

ইউরোপীয়ানদের যে ইসলামিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি এতো ঝোক ছিলো এটা যে শুধু মাত্র ২ শতাব্দী পূর্বে ছিলো তা নয়, এখনও তাদের মাঝে এটা বিদ্যমান। ইউরোপীয়ানরা যে শুধুমাত্র আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানকে নিয়েছিল তা নয়, তারা

আমাদের জীবন চলার (Life style) পদ্ধতি থেকেও অনেককিছুই নিয়েছিল। আমি আপনাদেরকে একটি ঘটনা বলতে চাই। একদিন আমি জার্মানির ডুসেলড্রফ (Dusseldorf) শহরের একটি অর্থনৈতিক যাদুঘর পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। এই যাদুঘরের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এর নিচ তলায় রয়েছে বাথরুম। যুগের সাথে বাথরুমের কিভাবে উন্নতি হয়েছে এটাকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এর উপরের তলায় গাড়ির বিবর্তন দেখানো হয়েছে। এর উপর তলায় বিমানের বিবর্তন (evalution) প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু বিমানের বিবর্তন প্রদর্শনীর বিশাল একটি ফ্লোরকে ব্যবহার করা হলেও, বাথরুমের বিবর্তনটা খুবই ছোট একটি প্রদর্শন করা হয়েছে। এটা কেন হয়েছে কারণ হলো তাদের ঘর বাড়িতে কোনো বাথরুম ছিলো না কারণ পূর্বে তারা পানি ব্যবহার করত না। (এখনো জার্মান বাথরুমগুলোতে পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। কেন তারা পানি ব্যবহার করত না? যাদুঘরের বাথরুম যে রুমে প্রদর্শন করা হয়েছে সেখানের দেয়ালের উপর লেখাতে আমার চোখ আটকে যায়।

জার্মানির একজন বিখ্যাত দার্শনিক গয়েথ (Geothe) একদিক প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদন করার সময় দেয়ালে টানানো কাজের দিকে তাকিয়ে দেখেন তিনি সর্বশেষ একবছর পূর্বে পানি ব্যবহার করেছিলেন। আমাকে ক্ষমা করবেন, আজকে আমরা আমাদের বেডরুমের পাশেই বিভিন্ন আলমিরা ব্যবহার করে থাকি। এটা আমরা নিয়েছি ইউরোপীয়ানদের কাছ থেকে। অথচ তারা এটা ব্যবহার করত প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদনের জন্য। কেন তারা এমন ছিলো? কারণ তারা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জানত না। এমনকি ফ্রান্সের ভার্সাহ রাজপ্রসাদে কোনো শৌচাগার ছিলো না। যখন কোনো দূত আসত বা অন্যদেশ থেকে কোনো মেহমান আসত তাদেরকে দুপুরের পর প্রসাদে ঢোকার অনুমতি প্রদান করত এর আগে নয়। আর এটা হলো এক শতাব্দী পূর্বের ঘটনা।

সকালে না ডুকতে দেওয়ার কারণ হলো রাতের যে প্রাকৃতিক কাজ কর্ম সেরেছে সেটার গন্ধ যেতে দুপুর পর্যন্ত সময় লেগে যেত। মুসলিমগণ শুধুমাত্র ইউরোপীয়ানদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষাই প্রদান করেনি বরং তারা সকল মানুষকে মানবিক মূল্যবোধও শিক্ষা দিয়েছে। আজকে ইউরোপে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এটা মুসলিমদেরই অবদান। এজন্য আজকে মুসলিমদেরকে হীন ও নীচু মনে করা তাদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করার কোনো অধিকার ইউরোপীয়ানদের নেই। কারণ মুসলিমগণ তাদেরকে যা দিয়েছে তা যদি আজ ফেরত চায় তাহলে ইউরোপীয়ানরা উলঙ্গ হয়ে দরিদ্রের মতো পড়ে থাকবে। কেননা তাদের মস্তিষ্কে যে জ্ঞান রয়েছে সেটা দিয়েছে মুসলিমরা, তার পরনে যে

পোশাক সেটা শিখিয়েছে মুসলিমরা, তার মধ্যে সকল সভ্যতা ও মানবিয়তা সৃষ্টি করেছে মুসলিমরা।

মুসলিমগণ মানব সভ্যতাকে সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে। ইউরোপীয়ানরা না বুঝে এই জ্ঞানকে নিয়েছিল। কিন্তু শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পর তারা এটাকে বুঝতে শুরু করেছিল। নিজে থেকে কিছু করার উদ্দীপনা পেয়েছিল তাদের অবস্থা আজকে অনেক দূর এসে বোতলের গলায় আটকে পড়ার মতো। এই সরু পথ থেকে বের হওয়ার শক্তি তাদের নাই এমনকি তারা সামনের দিকেও যেতে পারবে না। কারণ হলো যে সকল মূলনীতি সমূহকে আগে পেশ করা হয়েছে এগুলোর জায়গায় নতুন করে সূত্র বা মূলনীতি তৈরি করার যোগ্যতা তাদের নেই। তাহলে কি হবে? এ প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাদের এইভাবে দিতে চাই এরকম একটি কথা আছে। মানুষের কাছে সকল মৌলিক জ্ঞানগুলো এসেছিল নবীগণের মাধ্যমে। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয়, ঈমান, আখলাক, দ্বীন ও ইবাদতের পদ্ধতি নবী করীম সা. এর মাধ্যমে আমরা শিখতে পেরেছি। কিন্তু বস্তুগত বা জাগতিক জ্ঞান নবীদের মাধ্যমে এসেছিল কিনা আমরা সবাই সেটা জানি না।

উদাহরণ স্বরূপ, জাহাজ তৈরি করা সম্পর্কিত মৌলিক চিন্তা বা ধারণা নূহ আ.-এর নৌকার ঘটনার মাধ্যমে আমরা শিখতে পেরেছি। দর্জি হযরত ইদ্রীস আ.-এর মাধ্যমে, চিকিৎসা হযরত ঈসা আ.-এর মাধ্যমে, জাদুবিদ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান মুসা আ.-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। নবীদের মাধ্যমে আগত এই বিষয়গুলোই আজ জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল চাবিকাঠি। আমরা আমাদের এখানে যতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এর সকল জ্ঞান কুরআনে কারীমের মাধ্যমে মানব জাতির কাছে এসেছে। এই জন্য আজকে আমরা যে যুগে যে সমাজে বসবাস করছি আমরা যদি শান্তি কল্যাণ ও বরকত চাই তাহলে কুরআনে প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী চলা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

আমরা বলে থাকি যে, আজ আমরা মহাকাশ এর যুগে বসবাস করছি। অথচ কুরআনে মহাকাশ সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে। কিন্তু আমরা এটা জানি না।

কুরআন আমাদের সকল কিছু সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছে কিন্তু আমরা তা জানি না। কুরআন আমাদেরকে সকল কিছুরই নিদর্শন দিয়েছে। কুরআনে মহাকাশ সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে, এখানে সেই সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করা সময় সল্পতার জন্যে সম্ভব নয়। কিন্তু শুধুমাত্র একটি পয়েন্ট আলোচনা করতে চাই। আর সেটা হলো, যেমন আমি পূর্বে বলেছিলাম যে, বিভিন্ন সূত্রের আবিষ্কারক হলো মুসলিমগণ। যখন আমরা এই সূত্রগুলোকে সংকোচিত করি

তখন আমরা এখানে তিনটি জিনিস খুজে পাই। এই সূত্রগুলোর মূল কি এটা তারা কেউ জানে না। অর্থাৎ এগুলোকে বুঝতে হবে। আর এগুলো বুঝার জন্য কুরআনের সাহায্য নেওয়া ছাড়া বুঝা সম্ভব নয়। এটা কিভাবে হবে? দেখুন আমার একজন বন্ধুর একটি প্রবন্ধ রয়েছে সে আমিরিকাতে দশ বছর শিক্ষকতা করেছে। সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সে আলোচনা করে যে সে প্রাচীন একটি বই খুজে পেয়েছে। সেটা হলো বিখ্যাত কবি ইউসুফ হাস হাজিব এর লেখা একটি কবিতার বই নাম হল (kutadgu Bilig), ইউসুফ হাস হাজিব একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। আমরা যদি এই ব্যক্তিকে শুধুমাত্র একজন আধ্যাত্মিক কবি হিসাবে বিবেচনা করি তাহলে আমরা ভুল করব। আমার বন্ধুকে তার কিছু কবিতা দৃষ্টি কেড়েছে। দেখুন তিনি কি লিখেছেন "হে এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা, কেউ তোমার সমকক্ষ হতে পারবে না। শুরুতেও তুমি ছিলে। সকল কিছুর ধ্বংসের পরেও তুমি থাকবে। সকল সৃষ্টি তোমার অমিত্ত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তুমি সৃষ্টি করেছ দুটি, যার একটি তোমার স্বাক্ষী।" যখন আমরা এটা পড়ি তখন মনে করি যে, এটি আল্লাহ তায়ালার গুণগান বর্ণনা করে আত্যাত্মিক একটি কবিতা তিনি লিখেছেন।

দশ বছর যিনি প্রফেসর হিসাবে শিক্ষকতা করেছেন আমার সেই বন্ধুর মাথাকে এটা দারুনভাবে প্রভাবিত করেছে। কেন? অবশ্যই আমরা জানি না। আমার এই বন্ধু সংখ্যা সম্পর্কিত একটি বই লিখেছে। ১, ২, ৩... যে সংখ্যাগুলো আছে এদের সাথে সম্পর্কৃত একটি বই সে লিখেছে। এগুলোকে এমনভাবে গণনা করতে হয় যে, একটি আরেকটির অস্তিত্বকে স্বীকার করে। এরপর অন্যগুলা পুনরাবৃত্তি হয়ে পরবর্তীতে সামনে আসে। অবশ্যই এগুলোর নির্দিষ্ট কোনো গন্ত ব্য নেই। গণিতে কিছু স্বত:সিদ্ধ (Axiom) নীতি রয়েছে। ইতালিয়ান গণিতবিদ পিয়ানো (peano) এই স্বত:সিদ্ধ নীতিগুলোকে নিয়ে ৫ বছর গবেষণা করেছেন একই সংখ্যাগুলোকে ক্রমভাবে সাজানোর জন্য পিয়ানো (peano) কে আজকের গণিত বিদগণ গণিতের স্বত:সিদ্ধ নীতির জনক বলে থাকেন।

কিন্তু আমার বন্ধু গণিত প্রফেসর তার "ইসলামী সভ্যতা" নামক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, "এ স্বত:সিদ্ধ (Axiom) নীতিটি পিয়ানে ৫ বছর ধরে লিখেছেন। আর ইউসুফ হাস হাজিব আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত চার লাইনের একটি কবিতা লিখেছেন। আল্লাহ তায়ালার এই গুণাবলীকে নিয়ে লিখতে অবশ্যই মেধার প্রয়োজন। আর এই যোগ্যতা পিয়ানোর যে যোগ্যতা বলে গণিতের পাঁচ বছর স্বত:সিদ্ধ (Axiom) নীতি লিখেছেন তার চেয়ে হাজিব চার লাইনে এই স্বত:সিদ্ধ নীতির ইংগিত দিয়েছেন। এটা দ্বারা কি প্রমাণ হয়না যে হাজিবের যোগ্যতা অনেক গুণে বেশি? আমি আমার বইকে বিশ্লেষণ করতে বাধ্য। ইউসুব

হাস হাজিব-এর প্রখর মেধার পাশাপাশি পিয়ানোর মতামতকেও প্রাধান্য দিতে বাধ্য। একই সাথে আমি এটাকে শুধু মাত্র পিয়ানোর প্রনীতি স্বত:সিদ্ধ নীতি বলে মেনে নিতে পারিনা। আমি এই নীতিকে হাছ-পিয়ানোর স্বত:সিদ্ধ (Axiom) নীতি বলে স্বীকার করি। কারণ এই নীতি বা এর ধারণা পিয়ানোর থেকে হাজিব ৪ শতাব্দী পূর্বে দিয়েছেন।”

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করেছি যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান কোথায় এসে পৌছেছে। এখানে আমি এগুলো একত্রিত করে সারাংশ পেশ করতে চাই। প্রথমে আমি আপনাদেরকে একটি প্রশ্ন করতে চাই : মানব জাতির ইতিহাসে জ্ঞান যখন আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগুচ্ছিল, কোন কারণে ইসলামী শাসনকালে জ্ঞান বিজ্ঞান এতো দ্রুত উৎকর্ষতা সাধন করল? কোন যাদুর কাঠি জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় এতো প্রাণ শক্তি প্রদান করল? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা একথা বলতে বাধ্য যে মহাগ্রন্থ আল কুরআনই হলো সে যাদুর কাঠি যেটা জ্ঞান বিজ্ঞানকে উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে।

দুনিয়ায় জ্ঞান বিজ্ঞানের এই উন্নতি মানবজাতির সভ্যতার এই উন্মেষ এবং মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করতে পারে একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আজকে পাশ্চাত্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে একটি প্রান্ত সীমায় এসে পৌঁছেছে এটা থেকে প্রশস্ত পথের সন্ধান দিতে পারে একমাত্র এবং কেবল মাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন। অপর পক্ষে কুরআনের জ্ঞান ব্যতিত একজন ব্যক্তি কখনোই একজন বিজ্ঞানী হতে পারবে না। আমরা অনেক সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে তুলনা করে থাকি। একজন খুবই প্রিয় ইসলামিক চিন্তাবিদ সুন্দরভাবে এর সমন্বয় করেছেন। তিনি একবার দীর্ঘ সময় ধরে বক্তৃতা করেন। তিনি তার বক্তৃতায় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের উপসংহার টানার পর একটি প্রশ্ন করেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন যে, “পাশ্চাত্যের দর্শন সমূহ আপনাদেরকে বুঝালাম। আপনারা দেখতে পেলেন যে, তাদের দর্শন হলো একে অপরকে প্রত্যাখ্যান করার দর্শন ডেসকারটেস (Descartes) আসল সে যে তার পূর্বের দর্শনিকের সকল কিছুকে ভুল বলে নিজের দর্শনকে তুলে ধরল।

তারপর আরেকজন এসে বলে কাচেঁর না এভাবে না এভাবে। ডেসকারটেস (Descartes) এভাবে বলেছে এটা এভাবে না এভাবে হবে। এভাবে পাশ্চাত্যের দর্শর এর মিলায়ে ফেলা হলো একজনের মতামতকে ভুল ধরে সেটাকে অস্বীকার করে প্রত্যাখ্যান করে অন্যজন সামনে এসেছে। এটাই হলো পাশ্চাত্যের দর্শনের ইতিহাস। কিন্তু প্রাচ্যের মুসলিম ইমামগণ, দার্শনিকগণ তার চিন্তাধারাকে প্রকাশ করেছে ক্রমধারাভাবে ধারাবাহিকভাবে। বড় বড় ইমামগণ তাদের কথাকে নবী করীম সা.-এর কথার মাধ্যমে শুরু করেছেন সাহাবিদের থেকে কেউ যখন

www.amarboi.org

উদ্ধৃতি দেয় তখন বলে যে অমুক রাবী এটাকে বর্ণনা করেছেন বড় বড় মনীষীগণ একজন আরেকজনকে শ্রদ্ধা করে তার সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের মতামতকে প্রকাশ করেন। আর ইউরোপীয়ানরা একজন অপরজনকে অস্বীকার করে কথা বলে থাকে। এখন আপনারাই বলুন সত্য কোথায় লুকায়িত? যেখানে সবাই পূর্বের বর্ণনা অবলম্বন করে কথা বলে তার মাঝে না যারা একজন আরেকজনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের মতামতকে পেশ করে? সত্যকে কি কখনো ভুল প্রমাণ করা যায়?

কিন্তু ইউরোপীয়ানদের কাজই হলো সকল শক্তি দিয়ে অপর জনের মতামতকে প্রত্যাখ্যান করা। তাহলে আমরা বলতে পারি সত্য যদি থাকে আর সত্য অবশ্যই আছে, আর সে সত্য হলো মুসলিমদের চিন্তা চেতনায় ও মুসলিম দর্শন।"

যখন আমরা উপরে দেখে জ্ঞানের জগতে দৃষ্টিপাত করি, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্য হলো: পাশ্চাত্যের মানুষেরা সত্যিকারের পথ নিদর্শন সম্পর্কে জানে না। এজন্য তারা সত্যকে অনুসন্ধান করে এবং বিশ্লেষণ করে দেখে যে না, এটা না ওটা সঠিক। অত:পর অন্যটা হাতে নেয় সেখানেও সত্য পায় না সেটাকেও প্রত্যাখ্যান করে। পাশ্চাত্যের মনীষিদের অবস্থা হলো এমন। কিন্তু প্রাচ্যের মনীষিদের অবস্থা তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে যখন জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করে তখন সে ইসলাম নামক চাবিকাঠি নিয়ে প্রবেশ করে কুরআনে প্রদত্ত্ব জ্ঞানের মাধ্যমে সে চতুর্দিকে আলোকিত করে। কুরআনকে ভিত্তি করে জীবন পরিচালনা করে, নিজে শিখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।

এই পদ্ধতিতে জ্ঞান ও বিজ্ঞান মুসলিমদের কাছ থেকে এসেছে। আর এটাই হলো মুসলিমদের পদ্ধতি। আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কেউ একথা বলতে পারবে না যে, পাশ্চাত্যে এটা আছে ওটা আছে। আমাদের জন্য ও পাশ্চাত্যের জন্য বের হওয়ার রাস্তা হলো একটাই আর সেটা হলো ইসলাম। একথাটি শুধু মাত্র আমাদের ঈমানের কারণেই বলতে পারি। আমি আমার জীবনের বড় অংশ জাগতিক জ্ঞানের গবেষণায় কাটিয়েছি। আমি একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি জাগতিক জ্ঞান বিজ্ঞান একটি সরু পথে আটকে যায়। আর এই সরুপথ থেকে প্রশস্ত পথের সন্ধান দিতে পরে কেবলমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

আমি আমার বক্তব্য এই আয়াত দিয়ে শেষ করতে চাই

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا • رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ •

বক্তব্যের তারিখ : **১৯৬৯**

www.amarboi.org

সৃজনশীল বই প্রকাশক ও বিক্রেতা

প্রত্যয় প্রকাশনী

৪৯১ ডি/২, এলিফেন্ট রোড, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭

মোবাইল: ০১৬৮৪৫১১৬৬৮, ০১৯৬৬০৫১৮৫৪